ধারাবাহিক

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্র

গৌতম সেন

বিরচিত

স্বনামধন্য জমিদার

রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ছেলেবেলার অনেক স্মৃতি আপনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কুস্তির আখড়ায় একদিন আদর কোরে নাম দিয়েছিলেন 'টাংরি।' সেই নাম আজো আপনি ভোলেন নি,—আমিও ভুলিনি আপনার স্নেহ। 'টাংরি'র ঋণ অপরিশোধ্য,—তবু আমার 'ধারাবাহিক' আপনার হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্ত হলাম।

আপনার স্নেহধন্য

টাংরি

লেখকের অন্যান্য বই :-

প্রিয়া ও মানসী

প্রিয়া ও জননী

ধূসর ধরণী

পল্লবের চার অধ্যায়

ডাক্তার (নাটক)

রামচন্দ্রের নরক দর্শন

(স্ত্রীভূমিকা বর্জিত ছেলেদের নাটক)

মদনানন্দের দার্জিলিং যাত্রা (যন্ত্রস্থ)

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী যুগে বাংলা সাহিত্যের যে ক্রমবিকাশ ও ক্রমান্বিত ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন উপন্যাস যদি বঙ্কিমচন্দ্র আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে পরবর্ত্তী অংশ লিখিবার ভার দিয়া যাইতেন, তাহার অন্যাংশ শরৎচন্দ্র লেখার পর বর্ত্তমান যুগে আসিয়া কি ভাবে শেষ হইত, তাহাই উপন্যাস-খানিতে পরিবেশন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ধারাবাহিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে বালুচর অতি প্রাচীন সহর। শতাব্দীর ধ্বংসস্তুপে ইহার অনেক খ্যাতি লুপ্ত হইয়া গেলেও, সুবে বাঙ্গালার নবাবের বহুকীর্ত্তি বক্ষে লইয়া আজিও এই প্রাচীন চর দাঁড়াইয়া আছে। আজিও ইহার পশ্চিমোপকূলে নীল সলিল বাহিনী বক্রগামিনী ভাগীরথী রজত প্রস্তরবৎ বিস্তৃত সৈকত মধ্যে বাহিতা হইতেছে।

এই বালুচরে এক প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার বাস করেন। নাম বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলিয়া এতদঞ্চলে ইঁহার খ্যাতি আছে। তসর নামাবলী পরা, মাথাটি যত্নপূর্ব্বক কেশশূন্য করিয়াছেন। কেশাভাবে চন্দনের যথেষ্ট ঘটা,—খুব লম্বা ফোঁটা। তিনি সকলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। যাহারা ভক্তি করিতে পারিত না তাহারা ভয় করিত।

বিহারীলাল কাছারি বাটীতেই অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। ভৃত্য রামহরি ঘণ্টায় ঘণ্টায় কলিকা বদল করিয়া দিয়া যাইত। সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কর্ত্তা উঠিবার নাম করিতেছেন না। পার্শ্বে প্রাচীন নায়েব শশধর মল্লিক মহাশয় হিসাব মিলাইতে মিলাইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মধ্যে মধ্যে বিহারীলাল নিজের নাসিকা গর্জ্জনে ভীত হইয়া চক্ষুরুন্মিলন করিতেছেন এবং মল্লিক মহাশয়ের দিকে বক্র-হাস্য করিয়া বলিতেছেন, মল্লিক, ঘুমাইলে না কি ?

এমন সময় বাহিরে কয়েক জনের কোলাহল শোনা গেল। তাহারা কাছারি প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কর্ত্তামহাশয়, হুজুর মা বাপ—

মল্লিক মহাশয় ধমক দিলেন। তখন একজন অগ্রবর্ত্তি হইয়া ঘটনাটি যাহা বিবৃত করিল তাহা সংক্ষেপে এই,—দীনু ময়রা তাহার মেয়েকে চোখ ঠারিয়াছে। হুজুর সুবিচার না করিলে তাহারা আদালত পর্য্যন্ত যাইবে।

বিহারীলাল বোধকরি তখনও ঝিমাইতেছিলেন। অহিফেনের মাত্রাটা কিছু বেশী হইয়া থাকিবে। হঠাৎ চটক ভাঙ্গিতেই তিনি শুনিলেন, দীনু ময়রার মেয়ে কাহাকে চোখ ঠারিয়াছে। বলিলেন, দীনু ময়রার মেয়ে, তাহার আবার এতদূর স্পর্দ্ধা হইল কবে হইতে?

যে লোকটি নালিশ করিতে আসিয়াছিল, সে ক্ষোভে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, হুজুর সে আমার মেয়ে, দীনু তাহাকে চোখ ঠারে।

কর্ত্তামহাশয় আবার তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। বলিলেন, দীনু আবার ময়রা হইল কবে হইতে?

কন্যার পিতা বলিল, আজ্ঞে হাঁ হুজুর, ওরা চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে ময়রা।

কর্ত্তা বিজ্ঞজনোচিত হাস্য করিলেন। বলিলেন, জমিদার-পুত্র জমিদার নাও হইতে পারে। আমি বলিতেছিলাম, দীনু ছেলে না বুড়া?

বাদী বলিল, আজ্ঞে কর্ত্তা, বুড়া কেন হইতে যাবে, বাইশ বছরের মদ্দ মানুষ।

কর্ত্তার হুকুম হইয়া গেল, দীনুকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া আনিবে এবং আগামী কল্য সারাদিন রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিবে।

কন্যার পিতা আভূমি প্রণত হইল। সকলে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। কর্তা বলিলেন, ছেলেমেয়েদের একটু চোখে চোখে রাখিও। আমাদের সেকাল আর নাই। সেকালের প্রসঙ্গ উঠিতেই নায়েব মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। তিনি জানিতেন কর্তা এইবার তাঁহার বাল্য-লীলা হইতে সুরু করিয়া অদ্যাবধি তিনি কিরূপ নিষ্ঠার সহিত জীবন যাপন করিলেন, তাহারই সবিস্তার বর্ণনা করিবেন।

কর্তা বলিলেন, একবার ছোটলাট বাহাদুর আসিয়াছিলেন। আমি তখন যুবক। নবাব বাহাদুর অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছেন। আমাকেও যাইতে হইবে। যাইবার সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়াছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম, লাট সাহেবকে খুসী করিবার জন্য কলিকাতা হইতে বাঈজীর দল আনয়ন করা হইয়াছে,—আমি তৎক্ষণাৎ যাইব না মনস্থ করিয়া পত্র দিলাম।

লোকটি বলিল, আজ্ঞে হাঁ। আপনার পুত্রও 'বাপ্ কা বেটা' হইয়াছে।

কর্তা মহাশয় মৃদুহাস্য করিলেন। ভৃত্য আবার কলিকা বদল করিয়া দিয়া গেল। মল্লিক মহাশয় তাঁহার হিসাবের খাতা লইয়া আগাইয়া আসিলেন। লোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

জমিদার মহাশয় বুঝিলেন, হিসাব লইয়া নায়েব কিছু গোলে পড়িয়াছে। বলিলেন, কোথায় মিলিতেছে না দেখাও দেখি।

মল্লিক বলিলেন, আজ্ঞে তা নয়। গতমাসে খোকাবাবু মাসিক বরাদ্দ ব্যতীত তিনশত টাকা অধিক খরচ লইয়াছেন।

কর্তা। কারণ কিছু দর্শাইয়াছেন?

নায়েব। আজ্ঞে না।

বিহারীলাল চিন্তিত মনে ধূমপান করিতে লাগিলেন।

মল্লিক মহাশয় খাতাপত্র গুছাইতে গুছাইতে বলিলেন, সম্ভবতঃ বিশেষ জরুরী কোন প্রয়োজন হইয়া থাকিবে।

বিহারীলাল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অধ্যয়নকালে এরূপ প্রয়োজন নিন্দনীয়। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া বাটী আসিবার জন্য আগামী কল্য শ্রীমানকে পত্র দিতে হইবে। ভুলিয়া গেলে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন অতি প্রত্যূষেই মহাল তদারকের অছিলায় মল্লিক মহাশয় বাহাদুরপুরে গিয়া বসিয়া রহিলেন। বিহারীলালও বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই খোকা ওরফে রঞ্জনলালকে পত্র লিখিতে ভুলিয়া গেলেন।

এই রঞ্জনলাল কর্ত্তার একমাত্র পুত্র। গ্রামে থাকিয়া পুত্রের পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া তিনি রঞ্জনলালকে কলিকাতায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে ভাড়া বাড়ীতেই চলিতেছিল। সম্প্রতি শোভাবাজারের সন্নিকটে একটি নূতন দ্বিতল বাটী খরিদ করিয়াছেন। পুত্রকে দেখাশুনা করিবার জন্য এক বৃদ্ধ সরকারকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন ভৃত্য পরিচর্য্যার জন্য রক্ষিত হইয়াছে। রঞ্জনলাল এফ, এ পড়িতেছে, পাস করিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই বোধ হয় সে সম্প্রতি ধনীর দুলাল হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ পার্টিতে নিয়মিত যাওয়া আসা চলিতেছে, বন্ধুমহলে খাতির বাড়িয়াছে।

পুত্রের জন্য বিহারীলাল অনেক করিয়াছেন, তবু গৃহিনীর মন পাইলেন না। পাঠককে বলিয়া রাখা ভাল, এই জমিদার গৃহিনী চালে

একটু ভারী। নানালঙ্কারভূষিতা বিপুলোরুকরচরণোরসী কম্বুকণ্ঠান্দোলিত রত্নহারা লম্বোদরা সুতরাং চালে ভারী হইবেন না কেন? কর্ত্তা দেখিলেন, গৃহিনীর মেজাজও ভারী, তাই রামহরির সহিত একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তিনি এই পাঁচবৎসর হইতে বহির্ব্বাটীতেই দিবানিদ্রা দিতেছেন; আজ ইহার ব্যতিক্রম হইল। আহারাদি শেষ করিয়া কর্ত্তা ভিতর বাটিতেই রহিয়া গেলেন। গৃহিনী রস কাটিয়া বলিলেন, আজ কি প্রজারা খাজনা দিবে না বলিয়া তাহাদের জমিদার মহাশয়কে শাসাইয়া গিয়াছে নাকি?

কর্ত্তা মধুর হাস্তে ইহার প্রত্যুত্তর করিলেন, না, মহল তদারকে আসিয়াছি।

গিন্নী। জমিদারী রাখিতে হইলে প্রজাদেরও খুসি রাখিতে হয়। প্রজা বিগড়াইয়াছে।

কর্ত্তা সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন। বলিলেন, বিগ্‌ড়াইয়া কে কাহার ক্ষতি করিতে পারে? আমি আর এক পয়সাও দিব না।

গৃহিনী নথ নাড়িয়া ঝঙ্কার দিলেন, মরণ আর কি!

কর্ত্তা। মরণ হইলে আমিই বাঁচিতাম। তুমি আর এই বয়সে কি বিগ্‌ড়াইবে। তোমার গুণধর পুত্র বিগ্‌ড়াইয়াছে।

গিন্নী। কিরূপ?

কর্ত্তা। নায়েব বলিতেছিলেন, রঞ্জন গত মাসে তিনশত টাকা অধিক খরচ লইয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় এত টাকা লইবার তাহার প্রয়োজন কি?

গিন্নী। বংশের একটি ছেলে। টাকা চিনিয়া থাক, তাহাকে পড়াইয়া আর কাজ নাই। কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে। কলেজে পড়িতে হইলে কিরূপ ব্যয়, তাহা তুমি জানিবে,—না, তোমার ঐ নায়েব মহাশয় জানিবে? আমার ভাই কলেজে পড়িয়াছিল। সে

গুমোর আমি করিতে পারি বটে। আর ছেলে বিগ্‌ড়াইতেছে বলিয়া তুমি শিহরিয়া উঠিতেছ কেন? তোমার পুত্র চরিত্রবান হইবে এই কি তুমি আশা কর?

কর্ত্তা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। বুঝিলেন, আর ঘাঁটাইলেই নদীর জল ঘোলা হইবে। তামাক বোধ হয় পুড়িয়া গিয়াছিল। ডাকিলেন, রামহরি।

রামহরি আসিয়া কলিকা বদল করিয়া দিয়া গেল।

গিন্নী আবার রস কাটিলেন। কই, আর বলিবার কিছু নাই বুঝি? সবাই না হয় চোখের মাথা খাইয়াছে, আমি ত আর খাই নাই। সহচরীর হাতের দুধটুকু না হইলে—আহা, বলনা, তুমিও একটু রসের জোগান দাও।

কর্ত্তা ঝিমাইবার চেষ্টা করিতেছেন। গৃহিনী বলিলেন, খোকা টাকা লইয়াছে, তাহার পৈতৃক বিষয়ের উপসত্ত্ব হইতে লইয়াছে— নায়েব মহাশয়ের কি?

কর্ত্তা প্রমাদ গণিলেন। দিবানিদ্রার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন। গৃহিনীকে শুনাইয়া বলিলেন, কাছারি বাটীতে কতকগুলি জরুরী কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে এখনই যাইতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিহারীলাল একবার করিয়া বাটীর বাহির হইতেন। কোনদিন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যাইত না। যেদিনের কথা বলিতেছি, সেদিনও বিহারীলাল বৈকালিক পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ঘাটে নৌকা প্রস্তুতই থাকিত। বিহারীলাল আসিতেই মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গার অপরপারে উত্তরাংশে বরানগর। একদা রাণী ভবানী এই বরানগরে বাস করিতেন। আজিও ভগ্ন-মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে সেকালের শিল্পচাতুর্য্য নয়ন মন বিমোহিত করিবে। কাহারও ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভ সকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়? ইহার কারুকার্য্য আজিও দুদণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। চারিদিকে অপূর্ব্ব ইষ্টকে খোদিত নরমূর্ত্তি সকল শোভা পাইতেছে। যদিও কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও বা পা ভাঙ্গিয়াছে। অঙ্গহীন হইয়াও আজিও তাহারা সুন্দর রহিয়াছে।

বিহারীলালের নৌকা এই বরানগরাভিমুখে চলিল। হেলিয়া দুলিয়া যেন কোন গরবিনী অভিসারে চলিয়াছে। নদীর জল বলিতেছে ছলাৎ ছল্। নৌকা ঘাড় দুলাইয়া সেকথার প্রত্যুত্তর করিতেছে মরণ আর কি!

বরানগরের ঘাটে জমিদারের নৌকা আসিয়া ভিড়িল। বিহারীলাল কোঁচান ধূতি চাদর এবং গিলাকরা পাঞ্জাবি যথাবিন্যস্ত করিয়া রূপাবাঁধান ছড়ি হস্তে নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। পাড়ার সকলেই জানিত, বুড়া জমিদার এই সময়টিতে প্রত্যহই সহচরীর বাটীতে আসিয়া থাকেন। আড়ালে তাহারা এই বুড়াকে লইয়া অনেক কিছুই বলাবলি করিত।

কেহ বলিত, সহচরীর কপাল ভাল। বুড়া হইলে কি হয়, এক শাঁসাল জমিদারকে ত আঁচলে বাঁধিয়াছে। কেহ রসিকতা করিয়া বলিত, বুড়ার আবার নূতন করিয়া যৌবন আসিয়াছে। কেহ বলিত, এখন রস মরিয়া ক্ষীর হইয়াছে। আবার কেহ বা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, ঐ রূপের এত কদর! বাস্তবিক সহচরীর রূপ ছিল না, কিন্তু রূপের ঠাট্ ছিল। সহচরী কাল। কিন্তু হইলে কি হয়? ভ্রমরও ত কাল। তাই বলিয়া ফুল কি ভ্রমরকে পরিত্যাগ করিয়াছে? সহচরীর বয়স হইয়াছে। কিন্তু বয়স হইলে কি হইবে? কাল ফিতাপাড় ধুতি পরিয়া সে যখন দাঁতে মিশি দিয়া গঙ্গার ঘাটে জল আনিতে যাইত, তখন প্রতিবেশী বুড়ার দল রস কাটিয়া বলিত, কি গো সহচরি, পাড়ায় আছি একটু নেক্ নজরে রাখিও।

সহচরী তৎক্ষণাৎ অপাঙ্গে বিদ্যুৎ হানিয়া বলিত, তা রাখিব বই কি। আমি আপনাদের দাসী বই ত নই।

চাটুয্যে। তোমার ঘরের ভাল অম্বুরি তামাক কবে খাওয়াইতেছ?

সহচরী। দাসীকে যবে হুকুম করিবেন।

চাটুয্যে। কর্ত্তা আসিয়াছেন নাকি সহচরি?

সহচরী। আসিলেনই বা।

চাটুয্যে। না, না, সে কিরূপে সম্ভব। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি।

এইরূপ হাসি-মস্করা সহচরীর সহিত ইঁহাদের প্রায়শঃই হইত। আমরা যেদিনের ঘটনা বলিতেছি, সহচরীর সেদিনকার বেশবিন্যাস একটু বিচিত্র রকমের। ফিতা পাড়ের পরিবর্ত্তে মোটা লালপাড় সাড়ি, কপালে খয়েরের টীপ, কাঁধের উপর চারু বিনির্ম্মিতা কালভুজঙ্গিনী তুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী। সহচরী বাটে

চলিয়াছে। তাহার চরণ দুইখানি আস্তে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুষ্পের মত, মৃদু মৃদু মাটিতে পড়িতেছিল।

চাটুয্যে মহাশয়ের দাওয়ায় তখন লোকজন বড় একটা ছিল না। চাটুয্যে মশায় কি কাজে ভিতরে গিয়াছেন। শুধু দত্ত মশায় বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছেন। সহচরীকে দেখিয়া দত্ত মশায়ের তামাক টানা বন্ধ হইয়া গেল। বলিলেন, সহচরি আজ চমৎকার সাজিয়াছ ত? বৃদ্ধ বয়সে আমারই মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছ।

সহচরী দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। তা মিথ্যা বলিব না। সহচরীর দাঁতের বাঁধুনি ভাল। কাল হইলেও সহচরী এই দাঁতের গুমোর করিতে পারে বটে। বলিল, মাথা আর ঘুরাইতে পারিলাম কোথায়? চাটুয্যে মশায় তবু এই গরীবের বাড়ী পদধূলি দিয়াছেন, কিন্তু আপনি ত কোন-দিন চৌকাঠও মাড়ান নাই।

দত্ত মহাশয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, যাইব সহচরী, যাইব।

সহচরী চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই চাটুয্যে মশায় বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, কাহার সহিত এতক্ষণ কথা বলিতেছিলে দত্ত?

দত্ত মহাশয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, কথা এমন কি,—সহচরীকে বলিতেছিলাম পাড়ায় প্রবীণ বলিতে আমরাই এই কয়জন। তা বাপু, আমাদের সম্মান যাহাতে বজায় থাকে সেই ভাবে চলাফেরা করিও। আমাদের না হয় বয়স হইয়াছে কিন্তু ছেলেপুলে লইয়া ঘর সংসার করি,—তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে ত।

চাটুয্যে মহাশয় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, বেশ বলিয়াছ। তা সহচরী কি বলিল?

দত্ত মশায় হুঁকায় জোরে দুইটি টান দিয়া বলিলেন, সে বেটী আবার বলিবে কি? আমার সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সে সাহস রাখে?

মাগীর সাজ ত দেখিলে না দাদা ! ঐ সাজ দেখিয়াই ত শঙ্কিত হইয়াছিলাম। অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল, তাই ছেলেরা কেহ নিকটে ছিল না।

চাটুয্যে। তা যাই বল দত্ত, সহচরী লোক ভাল।

দত্ত। হাঁ, তা ভাল। কাহারও অনিষ্ট সে করে নাই।

চাটুয্যে। পাড়ার ছেলেদেরকেও সে অন্যচক্ষে দেখিয়া থাকে।

দত্ত। তা সত্য। আমার রতন তাহাকে মাসীমা ডাকে।

চাটুয্যে সহাস্যে বলিলেন, ছোক্‌রা তাহা হইলে বুদ্ধি করিয়া তোমার সকল পথই খোলসা রাখিয়াছে দেখিতেছি।

দত্ত মশায় হুঁকায় প্রবল টান দিতে গিয়া কাসিয়া ফেলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মাবকাশে রঞ্জনলাল বাটী আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে আসিয়াছে তিন বন্ধু,—রমানাথ, বিজন প্রকাশ, নকুলেশ্বর।

বিহারীলাল নায়েবকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, উহারা সহর হইতে আসিয়াছে ; উহাদের আদব কায়দা অন্যরূপ। দেখিও, ছোকরারা আমাদের গেঁয়ো বলিয়া না যায়।

গৃহাভ্যন্তরে গৃহিনীও দাসদাসীকে অনুরূপ শিক্ষা দিতেছেন। আহারাদি বিষয়ে স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া তদারক করিতেছেন। পাচক ঠাকুরও তাহার কেরামতি দেখাইবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ বুঝিয়া অতি মনোনিবেশ সহকারে রন্ধন কার্য্য সমাপন করিতেছে। নায়েবের কড়া হুকুম, প্রজারা যে যেস্থান হইতে পাইতেছে মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে। বর্‌বরের গয়লা বংশ বিখ্যাত ; তাহারা দধি দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছে। খাগড়া হইতে ছানাবড়া আসিতেছে, আজিমগঞ্জ হইতে মালয় বরফি

আসিতেছে। এক কথায় জমিদার বাটীতে কয়দিন ধরিয়া উৎসব লাগিয়াই রহিল।

কলিকাতা হইতে বাবুরা আসিয়াছেন ইহা সকলেরই মুখে মুখে ঘুরিতেছে। তাহারাও ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় কি আছে দেখিয়া লইতেছে। মাঝি মাল্লাদের এই কয়দিন বিশ্রাম নাই। দাঁড় ঠেলিয়া আর লগি মারিয়া তাহাদের হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। খোসবাগ দেখিয়া আসিয়া রমানাথ কাঁদিয়া ফেলিল। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাবের সমাধি শিথানে সামান্য তৈল-প্রদীপও আজ জ্বলে না। সক্কা-পেক্ষা বিস্মিত হইল বিজন। প্রাচীন সৌধের এক একটি ভগ্নাংশ আজিও প্রস্তরবৎ খাড়া রহিয়াছে! কিরূপ মসলা সংযোগে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ডগুলি গ্রথিত হইয়াছে এবং যাহারা ইহা প্রস্তুত করিয়াছে তাহাদের দক্ষতায় সত্যই বিস্মিত হইতে হইবে।

এইরূপে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া কুড়ি দিন কাটিল। কলেজের ছুটিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। রঞ্জন ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বন্ধুরা যাইতে চাহে না। তাহারা বলে, আমাদের বেশ লাগিতেছে। কিন্তু রঞ্জনের ইহা ভাল লাগিবার কথা নহে। কলিকাতার ঐশ্বর্য্য তাহার মন ভুলাইয়াছে। দেশ ছাড়িয়া দেশকে ভুলিবার মত এতবড় আকর্ষণ আর নাই। না হইবেই বা কেন? কলিকাতায় প্রলোভন ত এক প্রকারের নহে। কেহ থিয়েটারের নেশায় মাতিয়া রহিয়াছে, কেহ রেস খেলিতেছে, কেহ বায়োস্কোপ দেখিতেছে; আবার কেহ ক্লাবে যাইতেছে, কেহ সমাজ গড়িতেছে, কেহ ভাঙ্গিতেছে। এক কথায় কলিকাতা হইল বিলাসী বাবুর দেশ। অন্যত্র বাবুদের মন বসিবে কেন?

একদিন বিহারীলাল পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, বাপু, বুড়া হইয়াছি,—কবে চক্ষু বুঁজিব স্থিরতা নাই এই সময় দেখিয়া শুনিয়া লও!

রঞ্জন বলিল, আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছে। পুনরায় যখন আসিব তখন দেখিয়া শুনিয়া লইব।

কর্ত্তা আর কিছু বলিলেন না। নায়েবের দিকে চাহিয়া আদেশ করিলেন, একবার খাতাপত্র লইয়া কাছারি বাটীতে আইস।

ভৃত্য আসিয়া তামাকু দিয়া গেল। মুদ্রিত চক্ষে বিহারীলাল অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার যেন তন্দ্রা ভঙ্গ হইল। বলিলেন, গতমাসে সোনারপুরে টাকা পাঠাইয়াছিলে মল্লিক?

মল্লিক মহাশয় গতমাসের হিসাব বহি খুলিয়া দেখাইলেন, তাহাতে লিখিত আছে,—সোনারপুরে মাসিক ভাতা বাবদ দুইশত টাকা প্রেরিত হইল।

বিহারীলাল আবার চক্ষু মুদিলেন। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। সারাদিনের প্রখর রৌদ্রতাপের পর এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যা বড়ই মনোরম। ভৃত্য আসিয়া আবার তামাকু বদল করিয়া দিয়া গেল। বাহির দরজায় একজন মালা বিক্রেতা তারস্বরে হাঁকিয়া গেল, চাই মতির মালা।

কর্ত্তা। কে হে, ফটিক না কি?

ফটিক। আজ্ঞে, হাঁ কর্ত্তা।

কর্ত্তা। রাখিয়া যাও, যে কয়গাছা তোমার আছে?

ফটিক এইরূপ প্রায়শঃই মালা দিয়া যাইত। বুড়া হইলেও বিহারী-লালের সখ ছিল। আতর এবং সুগন্ধী তৈল তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল। কেহ দেখিয়া ফেলিলে তিনি লজ্জা পাইতেন। কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিতেন, ইহাতে মন প্রফুল্ল থাকে। চুল পাকিলে কি হইবে? বুড়ার পাকা চুলে যত্ন ছিল। চিরুণী দিবার পূর্ব্বে প্রত্যহই একবার করিয়া বলিতেন, নিয়মিত চিরুণী ব্যবহারে কখন শিরঃপীড়া হয় না।

এককালে বিহারীলাল সৌখীন পুরুষ ছিলেন। আজিও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। অধুনা সৌখীন বলিতে আমরা যাহা বুঝি,

সেকালে সৌখীনতার সেরূপ অর্থ ছিল না। যথার্থ সৌখীন পুরুষ সেকালেই ছিল। শস্তায় বাবুয়ানি করা একালের ধর্ম্ম। সেকালে সেরূপ হইবার উপায় ছিল না। আশীটাকা ভরি আতর না হইলে ব্যবহার যোগ্য হইত না। একালে জামা কাপড় ফর্সা হইলেই বাবুগিরি করা চলে, কিন্তু সেকালে জামা কাপড়ের মূল্য নির্দ্ধারণের উপর তাহার বাবুয়ানির যাচাই হইত। একালে 'বাবু' সবাই, কিন্তু সেকালের 'বাবু' অর্থে অন্যরূপ ছিল। সমস্ত পরগণার ভিতর 'বাবুদের বাড়ী' বলিতে একটিকেই বুঝাইত। যেমন এতদঞ্চলে এই জমিদার বাড়ীটিকে লোকে বাবুদের বাড়ী বলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন অতি প্রত্যুষে এই বাবুদের বাড়ী হইতে একজন স্ত্রীলোক সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ দেখিল না। শুধু দেখিল উপর হইতে রঞ্জনলাল। রঞ্জনলালের কৌতূহল জাগ্রত হইল। এতভোরে ঐ স্ত্রীলোক কোথায় চলিল? রঞ্জন নীচে নামিয়া আসিল। একজন ভৃত্যকে ঐ স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিতে আদেশ দিল।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, ঐ স্ত্রীলোকটি বড় বাবুর নিকট আসিয়াছিল। কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইতেছে তাহা সে কিছুই বলিল না।

রঞ্জনলাল ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন, এই সংবাদ লইবার জন্য তোমাকে পাঠাই নাই। আইস, কোন্‌দিকে গিয়াছে আমাকে দেখাইবে চল।

রঞ্জনলাল ভৃত্যকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটি একটি নৌকায় আরোহণ করিতেছে দেখিতে পাইল। স্ত্রীলোকটি বিপদ বুঝিয়া মাঝিকে নৌকা খুলিতে আদেশ করিল। মাঝি ক্ষিপ্রতার সহিত নৌকা খুলিয়া স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিল।

রঞ্জন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। একজন স্ত্রীলোক তাহাকে এইভাবে বোকা বানাইয়া দিয়া চলিয়া গেল? রঞ্জন পুরুষ হইয়া এইরূপ অপমান সহিবে কেন? তাছাড়া কৌতূহলও তাহার প্রবল হইয়াছে। কে এই স্ত্রীলোক? কেনই বা আসিয়াছিল?

রঞ্জনলাল দ্বিতীয় একখানি নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া বলিল, ঐ নৌকাটিকে ধরিতে হইবে, প্রচুর বক্‌শিস দিব। মাঝি স্বীকৃত হইল। রঞ্জন ভৃত্যকে লইয়া নৌকায় উঠিল।

একঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মাঝি সেই পলাতকা নৌকাখানি ধরিল। স্ত্রীলোকটি বুঝিল, ধরা যখন পড়িয়াছি তখন আর মিথ্যা বলিয়া ফল কি। মিথ্যা বলিলেই বা ঐ ভদ্রলোক বিশ্বাস করিবেন কেন? বরং মিথ্যা বলিলেই বিপদের সম্ভাবনা। জানিয়া শুনিয়া বিপদের মুখে যাইবার প্রয়োজন কি? মাঝিকে নৌকা ভিড়াইতে বলিয়া স্ত্রীলোকটি নৌকার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পরে যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, তুমি এতখানি পথ বৃথাই অনুসরণ করিয়াছ, আমি তোমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিব না।

রঞ্জন। তোমাকে পুলিসে দিব। তুমি চুরি করিবার উদ্দেশ্যে জমিদার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলে।

স্ত্রীলোকটি হাসিল। বলিল, সকল কথা তোমাকে বলিতে চাহি না। তবে চুরি করিতে যাই নাই, ইহা সত্য। এবং সব কথা শুনিলে

তুমি নিজেই লজ্জায় অধোবদন হইবে। আমার কথা জানিতে চাহিও না, ফিরিয়া যাও।

রঞ্জন। আমি যখন বাহির হইয়াছি, তখন তোমার সকল কথা না শুনিয়া যাইব না।

স্ত্রীলোক। যদি বলি, ইহাতে তোমার ক্ষতি হইবে?

রঞ্জন। আমি কে,—তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?

স্ত্রীলোক। জানি বলিয়াই তোমাকে নিষেধ করিতেছি। ফিরিয়া যাও।

রঞ্জন। ফিরিয়া যাইব বলিয়া কষ্ট করিয়া এতদূর আসি নাই।

স্ত্রীলোক। উত্তম। তবে এইটুকু শুনিয়া যাও, আমার সকল কথা তোমাকে শুনিতে নাই।

রঞ্জন উত্তেজিত হইল। বলিল, বারম্বার ঐরূপ কথা বলিয়া আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। আমি যাহা জানিতে আসিয়াছি জানিয়া যাইব।

স্ত্রীলোক। আমি বলিব না।

রঞ্জন। বুঝিলাম, বলিবার মত তোমার কিছু নাই।

স্ত্রীলোক। বৎস, আমাকে উত্তেজিত করিও না। আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। কোন অহিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসি নাই,—এই মাত্র শুনিয়া যাও।

রঞ্জন। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িব না।

স্ত্রীলোক। তোমার পিতা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন।

রঞ্জন। সে কৈফিয়ৎ আমি দিব।

স্ত্রীলোক। এইরূপ করিলে তোমার পিতা তোমার মুখদর্শন করিবেন না।

রঞ্জন। ঐরূপ ভীতি প্রদর্শনও অনর্থক নারী।

স্ত্রীলোক। বৎস, ফিরিয়া যাও। পিতার কলঙ্ক কাহিনী নিজ কর্ণে নাই বা শুনিলে।

রঞ্জন শিহরিয়া উঠিল। তাহার দেবতুল্য পিতা,—অপূর্ব্ব যাঁহার নিষ্ঠা, সৌম্যকান্তি, দেশমান্য লোক, তাঁহার বিরুদ্ধে রমণীর আজ এ কি অভিযোগ! বলিল, তোমার এই অলীক কাহিনী কেহ বিশ্বাস করিবে না।

স্ত্রীলোক। আমি ত বলিয়াছি, জানিতে চাহিও না। বিশ্বাস না হইলে আমার সঙ্গে যাইতে পার।

রঞ্জন। কোথায় যাইতে হইবে?

স্ত্রীলোক। সোনারপুর। কলিকাতার সন্নিকটে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, কোনদিন তোমার পিতাকে এইকথা বলিবে না।

রঞ্জন। বলিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম। কিন্তু আমার পিতার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ?

স্ত্রীলোক। সমস্তই সোনারপুরে বলিব।

রঞ্জন। আর বলিতে হইবে না, বুঝিয়াছি। তবে আর একটি কথা জানিতে কৌতূহল হইয়াছে। তুমি আমাদের বাটীতে কিরূপে প্রবেশ করিলে? কেহ বাধা দিল না?

স্ত্রীলোক। না। নায়েব মহাশয় সমস্তই জানেন। তিনিই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে আমি আরও কয়েকবার আসিয়াছি। এইবারে ধরা পড়িলাম।

রঞ্জন। কেন আসিয়াছিলে জানিতে পারি কি?

স্ত্রীলোক। পুত্রের পরীক্ষার 'ফী' দিতে হইবে। পত্র লিখিলেও চলিত, কিন্তু টাকা দাখিলের সময় আর নাই।

রঞ্জন তাহার নৌকা ফিরাইবার আদেশ দিল। ইহা শুনিয়া রমণী বলিল, আমার সহিত যাইবে না?

রঞ্জন উত্তর দিল, আমার কৌতূহল মিটিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে রঞ্জনের নৌকা অদৃশ্য হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এদিকে জমিদার বাড়ীতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। প্রভাতেই বিহারী-লাল শুনিলেন, রঞ্জনকে কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর মিলে নাই। লোক লস্কর, পাইক, পিয়াদা সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছে। বিহারীলালও একবার সদর একবার অন্দর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। রঞ্জনের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, রঞ্জন ফিরিল না।

নায়েব বলিলেন, থানায় একটা খবর দিয়া রাখিলে মন্দ হইত না।

বিহারীলাল ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন, ইহার মধ্যে পুলিস আনিয়া বিড়ম্বনা বাড়াইতে চাহি না। যাহা হইবার হইবে।

এমন সময় একজন পাইক আসিয়া খবর দিল, খোকাবাবু আসিতেছেন।

খোকাবাবু ওরফে রঞ্জনলাল যখন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, তখন সকলেই তাহাকে নানারূপ প্রশ্নবাণে উত্যক্ত করিতে লাগিল। কেহ বলিল, কোথায় গিয়াছিলে?—কেন গিয়াছিলে? কেহ বলিল, কি হইয়াছিল? কোন বিপদ হয় নাই ত? আবার কেহ বলিল, গিয়াছিলে, বেশ করিয়াছিলে; বলিয়া যাইলেই ত চুকিয়া যাইত। ইত্যাদি—

রঞ্জনলাল কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না। একবার পিতাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মাথা তুলিতে পারিল না। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে খোকা?

খোকা নির্ব্বোধের মত এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। বন্ধুরাও প্রশ্ন করিয়া কোন জবাব পাইল না। শুধু জানিতে পারিল, অদ্য রাত্রিতেই রঞ্জন কলিকাতা যাইবে।

বিহারীলাল পুত্রের এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু জোর করিয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেও তাঁহার ভয় করিতেছিল। কি জানি, কি করিতে কি হইয়া যাইবে! কর্ত্তা ভাবিলেন, জীবন-কুম্ভ যে তাঁহার ছিদ্রে পরিপূর্ণ। নিজে চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি অপরের দৃষ্টি রোধ করিতে পারিব?

গৃহিণীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, খোকা কি বলিতেছে?

গৃহিণী। বলিতেছে, আজই কলিকাতা যাইবে।

কর্ত্তা। কোথায় গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিছু বলিল?

গৃহিণী। না।

কর্ত্তা আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু চিত্ত তাঁহার সংশয়াকুল হইয়া রহিল। কাছারিবাটীতে আসিয়াও তিনি স্থির হইতে পারিলেন না। সুখে দুঃখে মল্লিক মহাশয় তাঁহার চিরসঙ্গী। সেই চিরসঙ্গী মল্লিক-মহাশয়কে বার বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না। শেষে বিরক্ত হইয়া খোকার কোন প্রসঙ্গই আর তুলিতে দিলেন না।

যথাসময়ে খোকা বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা যাত্রা করিল। অবশ্য ছুটি ফুরাইয়াছিল, খোকা একদিন যাইতই। দুঃখ সেইজন্য নহে। দুঃখ এই, সে এমন করিয়া গেল কেন? আর দুই চারিদিন থাকিয়া যাইলেই ত কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। কালের ধর্ম্ম। লেখাপড়া শিখিয়াও উহারা বিনীত হইতে জানিল না।

গৃহিণী বলিলেন, কি জানি বাপু, এ বাড়ীর চালই আলাহিদা। এতটা বয়স হইল, তবু ইহাদের মেজাজ বুঝিতে পারিলাম না।

নায়েব মহাশয় চতুর লোক, তিনি কিছু আঁচ করিয়াছিলেন। গত

শেষ রাত্রে সৌদামিনী এই বাটী হইতে বাহির হইয়াছে, খোকাও ঠিক সেই সময় হইতেই অনুপস্থিত। তারপর হইতেই খোকার অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন এবং আকস্মিক কলিকাতা যাত্রা। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে, খোকা সৌদামিনীকে দেখিয়াছে এবং তাহার সকল কথা শুনিয়াছে।

বিহারীলালও যে এইরূপ না বুঝিয়াছিলেন এমন নহে, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি না বুঝিবার ভাণ করিয়া নিরুত্তর রহিয়াছেন।

পাঠক, এই সৌদামিনীকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? লোকে বলে সৌদামিনী, কিন্তু ইনিই ধরিত্রীবক্ষে যুগ যুগান্তের লালসা-রূপিণী। ইনিই একদিন বিশ্বামিত্রের তপঃভঙ্গ করিয়াছিলেন, ইহারই বিলোল কটাক্ষে কত মুনির ধ্যান ভাঙ্গিয়াছে, স্বয়ং মহাদেবকেও তপস্যায় বিচলিত করিয়াছে। ইহারই জন্য মহানগরী ট্রয় ধ্বংস, সোনার লঙ্কা ছারখার হইয়াছে। রূপের আগুন লইয়া ইহারা সংসারকে শাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে আবার হাসাইতেছে। বিহারীলাল ত সামান্য মনুষ্য মাত্র।

সৌদামিনী বলিবে, অত কথায় তোমাদের কাজ কি বাপু? আমি পাইয়াছি ত ভোগ করিব না কেন? বিধবা হইলাম ত মরিলাম না কেন? বাঁচিলাম ত পৃথিবীর সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম কেন? আমি রাঁধুনীবৃত্তি করিয়া নিজে একবেলা হবিষ্যান্ন করিব, আর তোমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যাহা ইচ্ছা করিয়া বেড়াইলেও তোমাদের জাতি যাইবে না,—ইহাই বা মানিব কেন? লোকে মন্দ বলিবে? কিন্তু বিধাতা কি চোখের মাথা খাইয়াছিল? সবই যদি লইয়াছিল, তবে পোড়া যৌবনটুকু লইলেই ত সব গোল চুকিয়া যাইত। এ পোড়া যৌবন লইয়া আমি কি করিব? ওগো তোমরা যাহাই বল, আমার তখন কতটুকুই বা বয়স। সে আসিত, আসিলে হাতে স্বর্গ পাইতাম। না আসিলে চক্ষে অন্ধকার দেখিতাম। কত হাসি, কত গল্প, কত প্রলোভন। মনে করিতাম, ইহাই সত্য,—আর সব মিথ্যা। নিজেকে শক্ত করিয়া

বাঁধিতাম,—প্রতিজ্ঞা করিতাম, আর সহস্র প্রলোভনেও ধরা দিব না। কিন্তু সে আসিলেই সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম। তখন কি জানিতাম, ভোগেরও একদিন শেষ আছে! জানিলে ত মরিতেই পারিতাম। কিন্তু মরিব বলিলেই কি মরা যায়? আজ ত সকল সাধই মিটিয়াছে। তবে মরি না কেন? পোড়া মনের আজিও বাঁচিবার সাধ!

সৌদামিনী যাহাই ভাবুক, আমরা তাহার কথা লইয়া মরি কেন? সে ভাল করিয়াছে কি মন্দ করিয়াছে,—সে বিচার পাঠক করিবে। আমরা এই অবসরে যুবক বিহারীলালের কথা কিছু বলিয়া লই।

সৌদামিনী বিহারীলালের জ্ঞাতি, সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ। বিধবা হইবার পর বিহারীলালই তাহার ভরণপোষণ চালাইতেন। নিয়মিত যাতায়াতের ফলে গ্রামে একদিন নিন্দা রটিল। কিন্তু বিহারীলাল তখন সৌদামিনীর রূপবহ্নিতে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইতেছেন। তরঙ্গে যেমন হংসী নাচে, সৌদামিনীও তাহার যৌবন-সরোবরে তখন নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। বিহারীলাল কৌশলে তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দিলেন। উপস্থিত নিন্দার মুখ বন্ধ হইল। তাহার পর নায়েব মহাশয়ের কুশলতায় গ্রামে রটিয়া গেল, সৌদামিনী এক মুসলমানের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রঞ্জনের মনে কলিকাতার আকাশের একটি স্বতন্ত্র রং ছিল তাহার বনিয়াদি অনুশাসনের বিধিনিষেধ হইতে যাহা সম্পূর্ণ পৃথক। যাহাকে রঞ্জন আজকাল বলিতে আরম্ভ করিয়াছে কালচার। যাহার ফলে কলেজি-পড়া বিদ্যাটাকে সে গৌণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই সহপাঠিনী অবন্তিকার সুরে যদিও বিদ্রূপের ঝাঁজ ছিল, রঞ্জনের মনে

আজো তাহা দাগ কাটিয়া আছে। অবন্তিকার সেই কথারই জবাবস্বরূপ তাহাদের শোভাবাজারের সাবেকি-বাড়িটাকে সাবেকিয়ানা দোষে ত্যাগ করিয়া আসিয়া সে নূতন করিয়া বালিগঞ্জে ঘর বানাইল। বলিল, তোমাকে শাস্তি দেবার এইটিই আমার সহজ পথ।

অবন্তিকা হাসিল। ঐ হাসিতেই তাহার জবাব ছিলো, পাঠোদ্ধার করিতে রঞ্জনেরও দেরী হইল না। তাই সকলকেই হকচকাইয়া দিয়া একদিন অকস্মাৎ সে অন্তর্দ্ধান করিল। অবন্তিকা মুষড়াইয়া পড়িল। কিছুদিন কাটিল তাহার নিজেকে সামলাইয়া লইতে।

আজ চায়ের টেবিলে সেই কথাই উঠিল প্রথম। 'সেদিন অমন ক'রে চোলে গেলেন, ভাবলাম অপরাধ হয়ত কিছু ক'রে থাকব, কিন্তু শাস্তির সীমাও যখন উত্তীর্ণ হোলো তখন চিন্তা করবার কারণ ঘটলো। এক রকম গুটিপোকা আছে, তারা গুটি থেকে বেরিয়েই উড়ে যায়। কোন মায়াই তাকে বাঁধতে পারে না।'

রঞ্জন হাসিয়া উত্তর দিলো, মায়া যেটুকু সেটা নিজের তাগিদে। দেশের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে আমার স্থান সঙ্কুলান হোলো না। ছোট ছোট হাত দিয়ে সঙ্কীর্ণ জমিটুকু নিয়েই তারা বিব্রত। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, তারা সেই হাতে আবার দেবতার ফুল যোগাচ্ছে।

অবন্তিকা কলেজে-পড়া মেয়ে। কোন কথাকেই সে গভীরভাবে গ্রহণ করিতে নারাজ, তাই সে ঝাঁজের সঙ্গেই উত্তরটা দিলে, ব'লে যাবার সময় অবশ্যই হাতে ছিলো,—না, প্রতিবেশিনিদের অগ্নি-পরীক্ষায় রেখে গেলেন?"

রঞ্জন লাফাইয়া উঠিয়া অবন্তিকার হাত ধরিল। হাত আসিয়া হাতে মিলিলো, কথা থামিয়া গেল। দুজনেই চুপ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর এক সময় অবন্তিকার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া রঞ্জন বলিল, "ভুল করেছি, কিন্তু ভুল বুঝে তুমি যেন আমাকে শাস্তি দিও না।"

"শাস্তি পাবো জেনেই যারা নিশ্চিন্ত থাকে, তাদের শাস্তি স্বয়ং বিধাতাপুরুষও দিতে পারেন না। আপনার চলার বাষ্প ঠিক এঞ্জিনের মত,—চল্‌বো মনে করলেই যেখানে সচল সেখানে বাধা দেবে কে?"

"বাষ্প তৈরী করতেও যে জল আগুনের প্রয়োজন, সেও বা উপেক্ষণীয় কিসে? আসলটা হোলো মনে,—মন যেখানে অচল সেখানে তাকে নড়াবার সাধ্য ভগবানেরও নাই।"

"মনের এত বড় গর্ব্ব আমি সইতে পারিনে। মনের লাগাম যেখানে শক্ত ক'রে বাঁধা নেই, তাকে বিশ্বাস করাও তো সহজ নয়। পাগলা হাতীটার মন ছুটেছে ভাঙার দিকেই, তাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে অনর্থকেই ডেকে আনা হবে,—তাই শিকল দিয়ে বেঁধে শাসন করাই হলো নীতি।"

রঞ্জনের মন তখন দুলিয়া উঠিয়াছে,—বলিল, "শিকল দিয়ে বেঁধে দেহটাকেই আট্‌কানো চলে—মন চলে তারও উর্দ্ধে। সেখানেই কবির কাব্য। একদিন আমার গুরুমহাশয়রাও আমাকে অমনি আয়ত্বে আনতে চেয়েছিলেন,—নাগাল পেলেন না ব'লে তাঁরা চেঁচামেচি কর্‌লেন, ভয়ও দেখালেন,—কাজে লাগাতে পারলেন না। আমার ভিতরে একজন কবি আছে ঘুমিয়ে,—তাকে বাইরে থেকে ধরাও যায় না, জানাও যায় না, তাই ক্ষোভটা পড়েছে আমার 'পরে সব চাইতে বেশী। ঠিক এই কারণেই শোভাবাজারের বাড়িটা আমাকে একদিন পীড়া দিয়েছিলো। বুদ্ধিমানে বলবেন এটা দুর্ব্বুদ্ধি,—ভাবতেও চমৎকার লাগে এই দুর্ব্বুদ্ধিই আমাকে আজো চালিয়ে নিয়ে আসছে।"

"শুন্‌লে চমক লাগে,—যেন ভরানদীতে নৌকা ভাসিয়ে ব'সে আছেন, পারাপারের কোন খেয়ালই নাই। কেউ শক্ত ক'রে হাল ধ'রে থাকুক, সেদিকেও নাই দৃষ্টি—শুধু চলার আনন্দই আছে মনকে ছেয়ে।"

"ঠিক তাই। ঠিকানা জানবার ব্যাকুলতা নাই,—আছে চলার নেশা।"

"আমি কিন্তু তাও বলবো না। নদীর চলাকে যেমন নেশা বলা চলে না, সে চলে তার বেগে,—যে-বেগকে সে নিজে বাঁধতে পারে না, লাভ-লোকসানের কথা ভাবতেও জানে না।"

রঞ্জন বলে, "লাভ-লোকসানের খতিয়ান আছে আমার বাবার সেরেস্তায়, ছোটবেলায় ঐ অঙ্কশাস্ত্রকে ভয় ক'রে ক'রে তাকে এড়িয়েই চলেছি,—আজো জানি ওর প্রতি আমার লোভ নেই।"

অবন্তিকার সংশয় যায় না। রঞ্জনের ঠিক সুরটি কোথায়,—স্পষ্ট করিয়া জানিবার উপায় নাই। সে যেন ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে ডানা মেলিয়া চলিয়াছে। কথা বলার মোলায়েম সুরে ও যেন সব-কিছুকেই ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অপরকে জানিতে দিব না এইরূপ কঠিন পণ সে যেন অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ব করিয়াছে। বলে, এইটাই স্বাভাবিক। কৃত্রিমতার সুরকে স্বাভাবিক করিয়া তোলাই যেন ওর সাধনা। তাই তো সে রঞ্জনকে একদিন বলিয়াছিল, তোমার পালতোলা নৌকার পিছনে দাঁড়িয়ে শুধু 'বাহবাই' দিতে পারি, সঙ্গ লওয়া শক্ত।

উত্তরে রঞ্জন জানাইয়াছিল, "বড় শক্ত কথা অবন্তিকা,—দূরে দাঁড়িয়ে 'বাহবা' দিতে হলেও শক্তির দরকার। সে-শক্তি সকলের থাকে না।"

"সকলেরই থাকে, তবে গলার জোরের কাছে সে-শক্তি চিরকালই পড়েছে চাপা।"

"একথা তোমার সত্যি নয় অবন্তিকা। শক্তিকে অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধা সকলের নেই,—সেও বড় শক্তি, যে সকলকিছু তুচ্ছ করতে পারে। তোমার পিসীমার মধ্যে আছে সেই শক্তি যেখানে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ানো চলে না। যেমন ক'রেই বল, সেখানে হার মানতেই হবে।"

সবার অলক্ষ্যে অবন্তিকার মুখে একটা হাসি মিলাইয়া গেল। সে জানে, পিসীর কাছে যেটুকু নকল, সেটুকু ধরা পড়িবেই। কি জানি কেমন করিয়া পিসী যেন সব বুঝিতে পারে,—এই বিশ্বাসই তাহাকে

আত্মনির্ভর করাইয়াছে। অবশ্য ইহা ছাড়া পিসীর অন্য পরিচয়ও আছে,—যা সাংসারিক হিসাবে তুচ্ছ নয়। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তিনি একদিন এই সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতেই এই সংসারের সকল দায়িত্ব তাঁহার মাথাতেই চাপাইয়া দিয়া অবন্তিকার বাবা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সদানন্দবাবু সওদাগরী অফিসে মোটা মাহিনার চাকরি করিয়া বেশ দুপয়সা রাখিয়া গিয়াছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, অবন্তিকার কোনদিন অনাদর হইবে না। অবন্তিকাও পিসীকে সেই সম্মানই দিয়া আসিয়াছে। বরং অনুযোগের সুরে সে এইকথাই বলিয়াছে, পিসী, আমাকে খুব বেশী প্রশ্রয় দিও না, দুঃখ পাবে।

পিসী হাসিয়া বলিয়াছেন, ওটা নিয়তির কথা। আগুন দগ্ধ করে ব'লে তাকে ভয় করাটাই বোকামি।

হঠাৎ রঞ্জন যেন ধ্যান ভাঙিয়া উঠিল, এমনি স্তিমিত তাহার স্বর। "তুমি বিশ্বাস কর অবন্তিকা, এই একটি মুহূর্ত্তে আমি সারা পৃথিবী ঘুরে এলাম।"

অবন্তিকাও তাহার সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, বলেন কি! ঐ নৌকো ক'রে?

"নৌকো একটা উপলক্ষ্য, সেটা ডাঙায় চলছে কি জলে চলছে,—না কেউ রসি দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে বাঁধা সড়ক দিয়ে—সেদিকে ছিলো না দৃষ্টি। শুধু গ্রাম, নগর, প্রান্তর পার হ'য়ে চলেছি যেন কত দেশ, কত মহাদেশ, কত বিচিত্র উপকণ্ঠ। দেশ ভ্রমণের সখ আমার নেই অবন্তিকা, যেমন তোমরা যাও কত অর্থ ব্যয় ক'রে বিভিন্ন যানের বিভিন্ন কসরৎ দেখিয়ে। আর সেই সঙ্গে মনে করো দেখি, মন চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে তার ডানা মেলে হাওয়ায় উড়ে?"

ঠিক এমনি সময় তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন মহামায়া। বলিলেন, "আজ কি নিয়ে তর্ক চলেছে শুনি।"

"তর্ক নয় পিসীমা, উনি মনে মনে এতক্ষণ পৃথিবীভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তাই বলছিলেন লোকে মিছিমিছি অর্থব্যয় করে, মনের মত শ্রেষ্ঠ এঞ্জিন আর নেই।"

রঞ্জনের মুখের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া মহামায়া হাসিলেন। একদিন মহামায়া বলিয়াছিলেন, জীবনটাকে যাহারা কবিতার মত করিয়া গড়িতে চাহিয়াছে, তাহাদের সংসারের খুঁটিনাটি কাজে লাগাইতে গেলে বিপদেই পড়িতে হয়। পিসীমার এই নিদারুণ কথা রঞ্জন ভোলে নাই,—তাই পিসীমাকে সে যথাসাধ্য এড়াইয়াই চলিত। রঞ্জনের পুঁজি অল্প,—যাহা সহজেই ধরা পড়ে। তাহার ধারণা ছিল, অবন্তিকাকে সে জয় করিয়াছে, পিসীর বাধা একদিন অতিক্রম করিবে।

ছেলেটির প্রতি মহামায়ার লোভ ছিল, আবার ভয়ও ছিল, হঠাৎ জলের ঝাপ্টায় রংমাখা মুখখানা না ধুইয়া যায়। তাই মহামায়া শাসনের দিকটা রাখিয়াছিলেন কঠোর, ব্যবহারে অতি মৃদু।

রঞ্জন বলিল, পিসীমা অভয় দিন তো বলি।

পিসীমা অভয় দিলেন।

"বিশ্বকর্ম্মা করিৎকর্ম্মা লোক, তার মাথার চেয়ে হাত বড় আর আমাদের কাজ নেই ব'লে হাতটাকে ছোট ক'রে মস্তিষ্ককেই প্রাধান্য দিয়েছি। হাতের কাছে যা পাই তাই ভাল, চেষ্টা ক'রে ধরব সে-শক্তি নাই,—নাগালও পাইনে। একদিন ভারতের বাইরে যাবার স্বপ্ন ছিলো, কিন্তু নিজেকে চালাতে হোলে যে-শক্তির প্রয়োজন সে-শক্তি আমার নেই। মাথা খাটিয়ে যা-কিছু রচনা করেছি, তাও দেখছি ঠিক সুরটি মেলেনি। সৃষ্টিকর্ত্তার রচনায় কোথায় আমার ফাঁক আছে,—সেই

ফাঁক ভরিয়ে তুলবো সে-শক্তিও আমার নেই। তাই শক্তিকে আনতে চাই ঘরে—যিনি শক্তি যোগাবেন আর অভয় দেবেন।"

"তার চেয়ে বলো না বাবা তিনি তোমাকে পরিচালনা করবেন।"

"ঐ শব্দটি আমি উচ্চারণ করতে চাইনি পিসীমা,—সকলকে ছোট ক'রেই ও যেন স্পর্দ্ধিত।"

পিসীমা হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে চালাবার গর্ব্বও তার থাকা চাই, নইলে নিজেকে ছোট করার সঙ্গে তাকেও ছোট করা হবে। বাড়ির দাসীও একটা সংসার চালায়, মনিবকেও তার শাসন মানতে হয় কিন্তু সে নিয়ে তার গর্ব্ব নেই।"

"অনেকটা আমার বাবার তামাক খাবার নলের মত,—রূপোর উপরে চুনোট কাজ করা। সেটা রূপো না হ'লেও চলতো, কিন্তু তাকে মর্য্যাদা দিতে হোলো।"

"ঠিক তাই। তুমি যাকে ঘরে আনবে সে যেন তোমার যোগ্য হ'তে পারে। দেখতে হবে, তোমার সুরের সঙ্গে ঠিক সুরটি আছে কিনা। সব মেয়েই সকলের যোগ্য হয় না, এই ভুল করি বোলেই অশান্তি পাই।"

রঞ্জনের চোখ বুজিয়া আসিল। মৃদুকণ্ঠে জানাইল, অবন্তিকা, তুমি নেবে আমার সেই ভার,—যে আমার স্বপ্নকে করবে সার্থক?

অবন্তিকা নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রঞ্জন বুঝিল, ঠিক সুরটি লাগে নাই।

পিসীমা বলিলেন, "সময় লাগবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রঞ্জনের ভিতর জমিদার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। সে শয়তান,—দাম্ভিক। ইহা তাহার অন্তর্রূপ। এখানে সে চায় আপন মুঠির ভিতর সকলকে ধরিতে,—অপরের দম্ভ সে সহিতে পারে না। তাই অবন্তিকার উপেক্ষা আজ তাহাকে নাড়া দিলো।

এদিকে অবন্তিকাও মনে মনে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। রঞ্জনের কথাগুলো তাহাকে তীরের মত বিঁধিয়াছে। নিজেকে জানিতেও যেখানে সময়ের দরকার, সেখানে জোর তাগিদ চলে না। ধৈর্য্য যাহার নাই, তাহাকে গ্রহণ করিতে মন চায় না। রঞ্জনকে সে এই কথাই বলিবে, তোমার মুখোস খুলিয়া ফেলো, আমার কাছে স্পষ্ট হও,—পরস্পরকে চিনিবার সুযোগ দাও,—নহিলে বোঝা হইয়া রহিব তোমার জীবনে। পিসীকে ডাকিয়া বলিল, আমাকে আদেশ করো পিসী,—আমার কাজ সহজ হোক্।

পিসী বলিলেন, নিজের কাছেই জবাব নাও, তবেই মনে বল পাবে।

সেদিন সকালে চায়ের টেবিলে রঞ্জন ইচ্ছা করিয়াই গেল না। মনে ছিলো তার অহঙ্কার,—না ডাকিলে যাইব না এমনি একটা দুরাশাও তাহার অন্তরে ছিলো। এমন সময় আসিল বিহারীলালের সুদীর্ঘ-পত্র। তিনি কি করিয়া খবর পাইয়াছেন, পুত্রের জীবন ঠিক ধারাবাহিক খাতে চলিতেছে না। বালিগঞ্জের বাড়িটার প্রতিও তাঁহার কটাক্ষ ছিলো। এই অনাচারকে ঠেকাইতে মারণাস্ত্রস্বরূপ এক সুন্দরী কন্যাকে তিনি মনোনীত করিলেন। ইচ্ছা, বিবাহের পর সস্ত্রীক রঞ্জন বালিগঞ্জের বাসাতেই থাকিবে। সহরে থাকিয়া স্ত্রীর সহবত শিক্ষা এবং রঞ্জন ইচ্ছা করিলে তাহার পড়াশুনাও যথামত করাইতে পারিবে। পুত্রকে তিরস্কার এবং

তাগিদ দিবার চেষ্টা তাঁহার আন্তরিক হইলেও, বাহিরে জোরগলায় প্রচার করিলেন, বংশের এই অনাচার তিনি কখনই ঘটিতে দিবেন না।

রঞ্জনের অহঙ্কার চূর্ণ হইল। বৈকালিক চায়ের টেবিলকে আর উপেক্ষা না করিয়া আজ সে দর্শন দিলো বিশেষ সাজে। অন্যদিনের হেলাফেলা সাজটাই ছিলো তাহার স্টাইল, যাহা এতদিন অগোছালো ছিলো তাহার বর্ণ ঘুচিয়া গেল। এ যেন তাহার রণসজ্জা,—জয় লইয়া সে ফিরিবে এমনি তাহার দৃঢ়তা।

অবন্তিকা মুখ টিপিয়া হাসিল। দুষ্টবুদ্ধি তাহার কানে কানে বলিয়া গেল, পাত্র স্বয়ং বাহির হইয়াছেন কন্যার খোঁজে,—হায়রে দুরাশা! কিন্তু কোথায় সেই মায়াপুরীর রাজকন্যা, যে মালা হাতে বসিয়া আছে রাজকুমারের আশায়? বলিল, এ কি সজ্জা!

"যেটা আজ বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে, ঠিক সেই রং লেগেছে আমার মনে। এ-সজ্জা বাহুল্য আমার অন্তরেরই প্রতীক। তোমাকেও তাড়া দেবো এই সঙ্কল্প নিয়েই বেরিয়েছি।"

"সময় দিতে হবে রঞ্জনবাবু।"

"জীবনের পাতায় সুসময় কদাচ মেলে,—তাকে অবহেলা করতে নেই।"

"প্রস্তুত হতেও যে সময় লাগে।"

"আমার হাতে যে আর সময় নেই, এও লজ্জার সঙ্গে জানিয়ে রাখি।" এতদিন ঘড়ির কাঁটাটাকে তুচ্ছ করেছি, আজ দেখছি সেই কাঁটাই আমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধছে। অবন্তিকা, তুমি সহজ ক'রে বলো, আমি মনে বল পাই।"

"সহজ হোতে পারছি কই রঞ্জনবাবু, নদীর স্বাভাবিক স্রোতকে বেঁধে তার জলকে স্বচ্ছ রাখতে চান? বাঁধ খুলে দিন তবেই বেগ সহজ হবে।"

"দেহ ও মনের নগ্নতাকেই কি তুমি সহজ বলো? সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্বয়ং সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে হ'লে তার মাধুর্য্য থাকে না,—আমাকে বুঝতে না-

পারার অক্ষমতা তোমার। চেষ্টা তোমাকেই করতে হবে,—সেখানে পিসীকে ডাকতে যেয়ো না।”

অবন্তিকা বলে, সেইজন্তেই তো সময় চাই। একদিন গৌরীদান সহজ ছিলো,—দান করার পূর্ব্বে গৌরী ছিলো গৌণ, আজ সে-নিয়মকে বাঁধতে গেলে চলবে কেন রঞ্জনবাবু।”

রঞ্জনের মুখ গম্ভীর হইল,—তবু অপেক্ষা করিবার বাসনা রহিল। হাসিয়া বলিল, “গৌরীকেও পতির জন্য তপস্যা করতে হয়েছিলো,—আজ পাত্র স্বয়ং প্রার্থী—”

“আপনার প্রার্থনা আমার মনে রইলো।”

মহামায়াকে আসিতে দেখিয়া রঞ্জন তাহার সুর নামাইয়া দিলো। বলিল, পিসীমা, ঘট্‌কালি করতে এসেছি,—পাত্র হাতে আছে, পাত্রীর নাগাল পাচ্ছি না।

মহামায়া বলিলেন, পাত্রীর নাক কেটে দাও।

অবন্তিকা হাসিয়া ঘর হইতে পালাইয়া গেল।

ইহার পর আর কথা চলে না,—তবু সে বলে, পাত্র কি অযোগ্য?

“ও তো তর্কের কথা। কিন্তু সকল তর্কের বাইরের কথা রুচি। রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ হোয়েও সোনা যেমন কারু কারু কাছে অচল। উমা নিজের বর নিজেই খুঁজে নিয়েছিলো,—তার তপস্যায় কেউ বাধা দেয়নি।”

“দুদিক থেকেই উত্তরটা কঠোর হ’লো। তবু পষ্ট ক’রে কিছু শুনতে চাই, সময় দেবার সময়ও সংক্ষেপ হোয়ে এসেছে, বাড়ির চিঠি পেয়েছি, উত্তর না দিলে অনর্থ হবে।”

“অসময়ে তাড়া দিলেও তো ফল হবে না রঞ্জন। অবন্তিকার মন আমি জানি, সেখানে পিসীমার আদেশ সইবে না।”

রঞ্জন এইবারেও হার মানিল। ইহা তাহার দ্বিতীয় পরাজয়। তাই আঘাতও বেশী করিয়া বাজিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কয়বছর ধরিয়া পাটের কারবারে বিহারীলাল যে-মুনাফা পাইয়াছিলেন তাহা আশাতিরিক্ত। কিন্তু এইবার লোকসান সামলাইতে তাঁহার জমিদারিতে টান ধরিল। বুঝিতে পারিলেন, ভাগ্যের আকাশে কোন্ দুষ্টগ্রহের ছায়া পড়িয়াছে। নায়েবমশায় জানাইলেন, এই সময় কিছু খরচ করিয়া গ্রহগুলাকে খুসী রাখা দরকার। উহারা উপদেবতা,—উপকার পাই আর না পাই, চটাইয়া লোকসান বাড়াই কেন।

অতঃপর গ্রহাচার্য্যকে ডাকাইয়া বিহারীলাল স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিলেন। গৃহিনীকে জানাইলেন, বালিগঞ্জের বাড়িটা বেচবার পরামর্শ দিয়ে খোকাকে পত্র দাও, ওটা রাখতে গেলে বিপদ বাড়বে।

"তা সত্যি, বাড়িটা বড় অপয়া।"

"পয়মন্ত হোয়ে সবাই আসে না। আমার হাটখোলার বাড়ি থেকে আমি যা পেয়েছি তাতে ছোটোখাটো একটা জমিদারি কেনা চলতো।"

ক্ষতির খবর আরও একদিক হইতে আসিল। প্রজারা বিনয় করিয়া খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছে,—নায়েব বলিলেন, এটা ওদের বজ্জাতি।

বিহারীলাল বক্রোক্তি করিয়া বলিলেন, ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

ঠিক এই সময় আসিল রঞ্জনের চিঠি। বেশী কথা নয়,—দুটি ছত্র লেখা, যাহা পড়িয়া বিহারীলালের চোখ কপালে উঠিল, মাথার রক্ত যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে টগ্‌বগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, রাগে তিনি কথা বলিতে পারিলেন না। সবেগে হাত নাড়িয়া নায়েবকে ঘর হইতে বাহিরে যাইবার ইঙ্গিত করিয়া ঘরের একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত পায়চারি করিতে লাগিলেন।

গৃহিনী আসিয়া বলিলেন, হয়েছে কি ?

"তোমার ছেলে আমার আদেশ মান্‌বে না।"

"স্পষ্ট ক'রে বলো। বুদ্ধি দিয়ে তার সহজ কথাকেও জটিল ক'রে তুলো না।"

"সে সময় চায়।"

"এ তো মন্দ কথা নয়।"

বিহারীলাল ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, তা মন্দ কি,—বালিগঞ্জের হাওয়া তার স্বাস্থ্য ও মনকে যে পরিমাণে সুস্থ ক'রে তুলছে, এরপরে দেশের জলবাতাস তার সইবে না। বন্ধুরা সাবধান হ'তে বলছেন, নইলে পস্তাতে হবে।

গৃহিনী সব কথা বুঝিতে পারিলেন না,—কতকটা আন্দাজ করিলেন, কতকটা বুদ্ধির জোরে বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। অপ্রসন্নমুখে বলিলেন, পাঁচজনের পরামর্শে তার বিচার নাই বা করলে,—বিদ্যাবুদ্ধিতে সে কারো চেয়ে খাটো নয়।

খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বিহারীলাল আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। প্রায় চীৎকার করিয়া জানাইলেন, হ্যাঁ, বিদ্যা তো খুব।

ইহার বেশী তাঁহার আর কথা জোগাইল না,—ভয় ছিলো, নিজের কথা আসিয়া পড়িলে প্রতিবাদ করা চলিবে না। তখন হার মানিতেই হইবে,—চুপ করিয়া মার-খাওয়ার বিষ চলে ফল্গুনদীর মত ভিতরে ভিতরে, আর্সেনিক বিষের ক্রিয়া যেমন।

"রঞ্জনের বিয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, সে ভাবনা ভাববার জন্যে আমি আছি।"

"কিন্তু ওখানে তোমার হুকুম চলবে না। আমাকে মান্‌তে হবে, নইলে বিপদ ঘটবে।"

"তোমার ক্রোধকে ভয় করবো না,—এ বাড়িতে অনেক বছর কেটেছে, শাস্তিও কম পাই নি। আমি নিষেধ করছি, ছেলেকে ক্ষেপিও না।"

"আমাকে অমান্য ক'রে বালিগঞ্জের মেয়ে ঘরে আনবার সাহস ক'রো না,—সে-অপমানের দণ্ড পেতে হবে তোমার ছেলেকেই।"

"তোমাকে হার মানতে হবে এও আমি ব'লে দিলাম। এ সংসারের উপর অধিকার আমিও কিছু কম রাখিনে। বাইরে কাছারি-বাড়ির শাসনকে ভিতরমহলে আনতে যেয়ো না,—আমি সইবো না। সেখানকার কর্ত্রী আমি, তুমি নও।"

বিহারীলাল আস্ফালন করিতে করিতে বাহিরে কাছারি-বাড়িতে আসিয়া বসিলেন। কতকগুলা নালিশ কয়েকদিন হইতেই জমা ছিলো. আজ অকারণে তাহাদের অভাবিত সাজা হইয়া গেল।

তাহার পর নায়েবের সহিত সমস্ত হিসাবপত্র শোধ করিতে গিয়া বিহারীলাল জানিতে পারিলেন, জমিদারীর অনেকখানি অংশ এবারে না ছাড়িলে ঋণ শোধ হইবে না।

সর্ব্বনাশ জিনিসটা অনেক সময় বাজ-পড়ার মতো, মারের আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জানিবার উপায় নাই। লোকসান যখন হইয়াছিল তখন হয়তো অল্পেই সামলাইয়া লওয়া যাইত। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল, লোভ বেশী করিতে গিয়া চড়ার বাজারে যা কিনিয়াছিলেন, শস্তার বাজারে তাহাই বেচিয়া দিতে হইল। তাহাতেও এতটা হইত না, একদিকের লোকসান বাঁচাইতে আর-একদিকের ঋণ বাড়িয়াই চলিয়াছিল,—শেষে থই পাওয়া গেল না। তাই একদিক দিয়া বিহারীলালের বাহিরটা যেমন শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভিতরে তেমনি ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। নায়েব আসিয়া জানাইলেন, এসময় মহালগুলা তদারক করিয়া আসিলে মন্দ হইবে না, সুফল হইলেও হইতে পারে।

আয়োজন হইল। বিহারীলাল সদলবলে আত্মগোপনের চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

নৌকা আসিয়া লাগিল বরানগরের ঘাটে। নায়েব বুঝিলেন, যাত্রাপথে সহচরী না হইলে চলিবে না।

গৃহিনী ঘটা করিয়া পূজা দিলেন। মানুষের হাত যেখানে পৌঁছায় না, সেখানে দেবতা রাখেন অভয়হস্ত,—বলেন, মাভৈঃ।

যথাসময়ে রঞ্জনের হাতে চিঠি পৌঁছাইল। সেও তাহার কর্মপন্থা স্থির করিয়া লইয়া রেসের বন্ধুদের সহিত মাতিয়া গেল। বলিল, হয় রাজা, নয় ফকির।

কোন্ দেশের রাজা ঘোড়াব হার-জিৎ খেলায় রাজ্যপণ করিয়াছে, কোন্ কোম্পানীর কত টাকা এই খেলায় সুদে-আসলে কয়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার হিসাব বন্ধুদের ছাপার খাতায়। রঞ্জন সব ভুলিয়া গেল। যে-দানব এতদিন তাহার ভিতর লুকাইয়াছিল, আজ সে পক্ষ-বিস্তার করিয়া তাহাকে ক্ষ্যাপাইয়া তুলিল, মাতাইয়া তুলিল।

মহামায়া বলিলেন, এ কার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছো বাবা ?

"ভয় পাবেন না পিসীমা, একদিন অহঙ্কার কোরে বোলেছিলাম, যাকে আনবো আমার ঘরে, তার হাতে নিজেকে দেবো ছেড়ে—তিনি লক্ষ্মীই হোন আর অলক্ষ্মীই হোন।"

"ও তো লক্ষ্মীছাড়ার খেলা।"

রঞ্জন হাসিয়া বলিল, খেলার জাতবিচার নেই, ভাল না লাগলে ছেড়ে দেবো। কিছুদিনের জন্য ছুটি নিলাম।

ঠিক এমন সময় আসিল মহামায়ার শ্বশুরকুলের আত্মীয় জ্ঞানাঙ্কুর, —সম্পর্কে দেবর। বলিল, "খোঁজ নিতে পারিনে বৌঠান, নিজের দেহও সুস্থ নয়,—সময় তার চেয়েও মন্দ।

রঞ্জনের উচ্ছাসে বাধা পড়িল। একটু ছট্‌ফট্‌ করিয়া সে বিদায় লইল।

জ্ঞানাঙ্কুর সন্দিগ্ধদৃষ্টি মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলেটি কে?"

উত্তরে মহামায়া যাহা বলিলেন, তাহাতে জ্ঞানাঙ্কুর খুসী হইল না। সময় অল্প হইলেও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই,—ছেলেটির প্রতি লোভ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বলিলেন, "ভাল নয়।"

"কি ভাল নয় ঠাকুরপো?"

"ছেলেটিকে আমার ভাল লাগ্‌লো না বৌঠান।"

"নিজের স্বভাবের উপর রং চড়াতে গিয়ে ও ঠকেছে,—মেকী সে নয়। ভুল বুঝতে পারলে লজ্জায় জিভ কাট্‌বে। অবন্তিকার কাছে আমল পেলে না ব'লে আজ এসেছিলো বিদায় নিতে।"

জ্ঞানাঙ্কুর হাসিয়া বলিল, "অবন্তিকা শক্ত মেয়ে। মেয়েটির দৃঢ়তায় চমক লাগে। অসময়ে বাপ-মা না হারালে ওর প্রতিভার স্ফূরণ হোতো।"

মহামায়া হাসিলেন। দেবরের মনোভাব তাঁহার অজানা ছিলো না। বিপত্নীক জ্ঞানাঙ্কুরের মনে দ্বিতীয় সংসারের সদিচ্ছা কিছুদিন হইতেই ঘুরিতেছে। রাজকন্যার রূপের কথা জানা না থাকিলেও, সঙ্গের রাজত্বের পরিমাণটা ছিলো জানা, তাই জ্ঞানাঙ্কুর লাভ এবং লোভের মত্ততায় আজ অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বৌঠানের শরণাপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু বৌঠান বড় শক্ত মেয়ে। আকারে-ইঙ্গিতে তিনি এই কথাই জানাইয়া দিলেন, অবন্তিকা পাথরের চেয়েও কঠিন। রূপে-গুণে রঞ্জন তো কারো চেয়ে ছোটো নয়,—কিন্তু তাকেও হট্‌তে হোলো ওর দৃঢ়তার কাছে। ঠিক সুরটি না লাগলে ও কারোর নয়।

"তা জানি ব'লেই ভয় হচ্ছে, কিন্তু লোভ তার চেয়ে বড়। সুর যদি না মেলে আমিও নেবো বিদায় ঐ রঞ্জনের মত,—তার আগে কিছুদিন বৌঠানের আতিথ্য চাই।"

মহামায়া অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলেন। অনর্থ যদি ঘটে, তাহার সমস্তটাই এক্ষেত্রে তাহাকেই বুক পাতিয়া লইতে হইবে। শক্ত হইয়া অনাত্মীয়কে বিদায় করা যেখানে সহজ, সেখানে নিজের দেবরের প্রতি অসম্মান করিতে তাঁহার বাধিল। তাই অনিচ্ছা থাকিলেও, অবন্তিকাকে ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে হইল।

কয়েকদিন পরে বৌঠান—নীচে যে-ঘরে জ্ঞানাঙ্কুর থাকিত, তাহারই দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জ্ঞানাঙ্কুর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি নীচে এলে কেন বৌঠান ?"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "দেখতে এলাম,—তোমার নতুন জায়গায় হয়তো অসুবিধা হচ্ছে,—তা স'য়ে যাবে, ধৈর্য্য হারিও না।"

কথার মধ্যে যে-প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিলো জ্ঞানাঙ্কুর তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল, তারপর বলিল, "হোটেলে থেকে শরীর ও মনকে শক্ত কোরে বেঁধেছি,—অনাদরেও ক্ষুব্ধ হইনে, আদরেও গ'লে পড়িনে।

মহামায়া খুব যেন নিশ্চিন্ত হইলেন এইভাবে বলিলেন, তা ভালই হয়েছে ঠাকুরপো,—ঐ অভ্যাসটুকু না থাকলে মানুষের দুঃখের আর শেষ হোতো না। অবন্তিকার পরীক্ষার দিন এগিয়ে এসেছে,—তবু সে তোমার খোঁজ নিতে ভোলেনি।"

জ্ঞানাঙ্কুর চাহিয়া দেখিল মহামায়ার মুখে বিদ্রূপের হাসি এবং ইহাও সে বুঝিল, একথা তাঁহার বানানো কথা, কিন্তু ধৈর্য্য সে হারাইল না। ইহাও তপস্যা,—দেবতাদেরও একদিন তপস্যা করিতে হইয়াছিল। পরাজয়ের আত্মাবমাননায় তাঁহাদের তপস্যার কঠোরতাই বাড়িয়াছে,—তপশ্চর্য্যা কমে নাই। মুখে বলিল, শুনেছি, তোমাদের অবন্তিকা পড়ুয়া-মেয়ে,—দু-একখানা বই আমাকে দিতে ব'লো, সময় যে আর কাটে না।

মহামায়া বলিলেন, "ওতো বাজে বই পড়ে না,—কলেজের পড়া-বই-এর ভারই বোঝা হোয়ে চেপেছে, অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার সময় কই। বরং ব'লে দেবো আমাদের রঞ্জনকে,—তার এদিকে রুচিও আছে, রকমারি সংগ্রহও আছে।

রঞ্জনের কথা মহামায়া ইচ্ছা করিয়াই শুনাইয়া দিলেন। জ্ঞানাঙ্কুরের মনে জ্বালা ধরাইয়া দিবার সুবিধা এই, আপদ-বিদায়ের পালাটা শীঘ্রই সম্পূর্ণ হয়। স্পষ্ট করিয়া যেখানে বলিতে বাধে, গোলযোগ ঘটে সেইখানেই। যদিও অবন্তিকার কাছ হইতে কোনো ভয় ছিলো না, কিন্তু মন সায় দেয় না অবন্তিকাকে নিলেমি বাজারে পণ্য করিয়া তোলায়। অবন্তিকা কলেজে-পড়া মেয়ে—পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলে তাহার জাত যায় না, কিন্তু পুরুষ যেখানে কোন উদ্দেশ্য লইয়া মিশিতে চায় সেইখানেই আসে প্রশ্ন।

রঞ্জন ছিলো এ-বাড়ির ছেলের মত। উদ্দেশ্য তাহারও কিছু নিরাসক্ত নয়। তাহার কবি-মন অবন্তিকাকে দেখিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে, লোভ করিয়া হাত বাড়ায় নাই। উহাদের কাছ হইতে ভয় নাই, উহারা ফিরিয়া যাইতে জানে, শোধ লইবার স্বভাব উহাদের নহে।

কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুর চুপ করিয়া থাকিতে জানে না, তাহার সুরেও ঝাঁজ দেখা দিল। মনে অহঙ্কার ছিলো, বৌঠানের প্রসন্নতা লাভ করিবে,—ভাসিয়া বেড়াইবার দুঃখ হইতে এবারে ঘটিবে মুক্তি। তাই সে একসময় বলিল, "আমার প্রতি অবহেলাটা বড় বেশী স্পষ্ট,—এটুকুর প্রয়োজন ছিলো না, চক্ষুলজ্জা ক'রে স্থান না-দিলে আঘাত নিয়েই ফিরতে হোতো, মানটা যেতো না।"

মহামায়া দুঃখ পাইলেন কিন্তু স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, "এ-বাড়ির চালচলনে তোমার বাধছে,—একদিন দেখবে কেমন সহজে মিশে গিয়েছো,

কোথাও আটকাচ্ছে না। অবন্তিকা বলে এই ধৈর্য্যই মানুষের অগ্নি-পরীক্ষা,—নকল যারা এই আগুনে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে।"

"পরীক্ষা দিয়ে পাসপোর্ট আদায় কোরে লওয়ার মধ্যে পৌরুষ নেই, বিবাহে বরই শ্রেষ্ঠ, কন্যার অধিকারকে খাটো করতে হবে সেখানে।"

"বিবাহস্থলে সেই রীতিই চল্‌তো। সামাজিক ভদ্রতা নিয়ে যেখানে প্রশ্ন সেখানে পুরুষের বিনীত হওয়াই নীতি।"

"বিবাহপূর্ব মেলামেশার দিশী নাম আমার জানা নেই,—ইংরিজিতে যাকে বলে 'কোর্টশিপ'—দুজনে পরস্পরকে জেনে নেবো, এই ছিলো আমার মনের কথা। তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে এলে সেই নীতিই নিতাম মেনে, আর তা নয় বোলেই নিজের গরজে নিজেকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে।"

মহামায়া খুব শক্ত করিয়া বলিলেন, জোর কোরে একটা কাণ্ড করতে যেয়ো না, অবন্তিকা আজো জানে না কি তোমার মতলব। জানলে আর রক্ষা থাকবে না এও তোমায় বলে রাখছি।"

"চুপ কোরেই যদি থাকি, তোমার কাছে কথা চাই।"

"শোন ঠাকুরপো, কোর্টশিপ করা এ-বাড়ির রীতি নয়। অবন্তিকা অসূর্য্যম্পশ্যাও নয়—এ-বাড়ির আদব-কায়দা দোরস্ত হোলেই দেখবে, তুমি এখানকারই একজন। তখন ঘটকালি করতে আমাকে ডাক্‌বে না। আর এও বলছি শোনো, মেয়েদের পছন্দের ধারাটা ঠিক একই নিয়মে চলে না,—নিরাশ হোয়ে ফিরতে হোলে দোষ দিও না। জেনো, সে-ত্রুটি তোমারই। সুরের যন্ত্র সকলের হাতে সমান বাজে না। সেটা হাতের গুণ, যন্ত্রের নয়।"

"বেশ তাই হোক বৌঠান, তোমাকেই মানবো। তারপর যা থাকে ভাগ্যে।"

মহামায়া হাসিলেন।

জানালার অপর পারে যে-গাছগুলা সোজা হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই একটা ডালে কাক-দম্পতি চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে, একটা নাম না-জানা গাছের পাতা রৌদ্রের আলোয় ঝলমল করিতেছে—তাহার কাঁচা সোনার বরণ ফুল, ঘন-গন্ধ ভারি হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে,—গন্ধের কুয়াশা যেন।

জ্ঞানাঙ্কুর বলিল, "জানো বৌঠান, আমার হাতে আছে ছুটি,—ইচ্ছা ছিলো সেই ছুটিকে কাজে লাগাবো। কিন্তু লাগলো না কোন কাজে। মনে অহঙ্কার ছিলো তোমাদের এখানে এসে ছুটির একটা সদ্গতি হবে। এখন দেখছি, আমার কোন গত্যন্তর নেই। তুমি এলে তাই কথা কোয়ে বাঁচলাম।

মহামায়া নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সম্প্রতি বিলাত ফেরত সুবোধ মিত্রের সহিত রঞ্জনের আলাপ হইয়াছে। জুয়াখেলায় উহার নাকি খুব হাত যশ। সুবোধ বিলাতে অনেকদিন কাটাইয়াছে। লোকে জানিত সে একটা বড় বিদ্যা আয়ত্ব করিয়া দেশে ফিরিবে, কিন্তু শিখিয়া আসিল গাছের চাষ। তাহাও দেশে আসিয়া কাজে লাগাইতে পারিল না। সে বলে, মাটি তৈয়ারী করিতে যে-অর্থ ব্যয় হইবে তাহাতে কোন জমিদারই রাজি হইবে না। আর সে-কালচারও কাহারো নাই,—অনর্থক সময় নষ্ট এবং পয়সা নষ্ট। পৈতৃক যাহা কিছু আছে, খেলাইয়া লইতে জানিলে ঐ টাকাই তাহার দশগুণ হইয়া ঘরে ফিরিবে।

কিন্তু বিলাত হইতে সুবোধ আর কিছু শিখিয়া আসুক, না-আসুক, ফ্যাসানটাকে দোরস্ত করিয়া লইয়াছে। কোন্ সময়ে কোন্ কলার ও নেকটাই-এর রীতি চলিত তা উহার মুখে মুখে। একবার এক দিশী-সাহেব ডিনারের পোষাক পরিয়া ক্লাবে আসিয়াছিল, সুবোধ হাসিয়াই অস্থির। কিন্তু সকলকে টেক্কা দিয়া গেল সুবোধের বোন মিলি মিটার। সে বিলাত যায় নাই—যাইবার ইচ্ছা আছে। দাদার দিশি-আচারকে সে সংশোধন করিয়া বলে, হুষ্টি, তোমার আজো এই অভ্যাস গেলো না! নিজের সংস্কারের উপর আপন ইচ্ছায় সে কাঁচি চালাইয়া দিয়াছে। নিজের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণ-প্রলেপের দ্বারা রঞ্জিত, সমুচ্চ খুরওয়ালা জুতা-জোড়া নিরন্তর খট্ খট্ শব্দে তাহার পদমর্য্যাদা বিঘোষিত করে, যেন ধরণীকে চলিয়াছে পীড়ন করিয়া,—যেন সে অন্য কাহাকেও দেখিতেই পায় না। যদিই বা দেখে, লক্ষ্যই করে না, এবং লক্ষ্য করিলেও তাহার দৃষ্টিতে থাকে ব্যঙ্গের হাসি। অঙ্গে গাউন চাপাইতে না পারায় তাহার ত্রুটি শোধন হইয়াছে শাড়ি পরার ভঙ্গীতে। লতার মত বেষ্টন করিয়া দেহকে জড়াইয়া থাকে তাহার শাড়ি, গুণগ্রাহীরা বলে, গাউন হার মানিয়াছে। রং-বেরং-এর ইস্ত্রিকরা ব্লাউজে বুকের অনেকখানি অংশ অনাবৃত রাখিয়া বিলাতি সাজের তারিফ করে। দাদার সহিত ঘোড়ার বাজি দেখিতে রেসে যায়, নিজে রেস খেলে না,—অপরকে খেলায়।

রঞ্জনের টাকা যখন ঘোড়ার মাঠে হাওয়ার মত উড়িতেছে তখন মিলি তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিতেছে। মিলি বলে, হার-জিতটাই আসল নয়, থাকা চাই স্পোর্টসম্যান স্পিরিট। তাহা রঞ্জনের ছিলো। ধাবমান অশ্বের প্রতি মন যখন তাহার দৌড়াইতে থাকে, পিছন হইতে মিলি দেয় তাহাকে বাহবা। রঞ্জন দেখিবার অবকাশ পায় না কোথায় কি ঘটিয়া চলিয়াছে।

সুবোধ মিত্র মিলিকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিল, "রঞ্জনকে এমন কোরে নিঃশেষ হোতে দিও না।

কথার মধ্যে যে-ইঙ্গিত ছিলো,—মিলি তাহা বুঝিল। তাই রঞ্জনকে একদিন তাক লাগাইয়া দিয়া বলিল, "রেসে আমরা আর যাব না স্থির করেছি।"

"হঠাৎ এ-বৈরাগ্য কেন?"

"ভেবে দেখলাম, ঘোড়ার চাইতে আমাদের দাম বেশী।"

"দামের কথা যদি বলেন, আমাদের কোন মূল্যই নাই।"

"সেটা সকলের কাছে নয়। বাপ-মা কানা-খোঁড়া ছেলেকে হারিয়েও কাঁদে।"

"ওটা কিছু নয়, লালন করার দুঃখ। বেড়াল ম'রে গেলেও যেমন অনেকে কাঁদে।"

"তাই বোলে ঘোড়া-গাধার সঙ্গে নিজেদের তুলনা করতে আমি রাজী নই।"

"আপনার দাদা শুনে রাগ করবেন।"

"দাদার কথা পরে হবে, আপনার ইচ্ছাটা বলুন।"

"আপনাকে অখুসী রেখে মাঠে যাবো, আমি এতটা হৃদয়হীন নই। ঘোড়ার সঙ্গে আমাদের তফাৎ এইখানে, ঘোড়ার মাঠ নইলে চলে না,—কিন্তু আমাদের চলে।"

"তাই বোলে মাঠে হাওয়া-খাওয়াটা বাদ দিতে চাইনে।"

"হাঁ, যখন সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল।"

মিলি উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। এই হাসিতে ঔদার্য্য ছিলো। কেন না, পুরুষ মানুষ নির্বোধ বলিয়া মিলির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটেনি। সে জানে, কঠিন পাথুরে-মাটিকেও কি করিয়া চিড় খাওয়াইতে হয়। ইচ্ছা আছে, বিলাত গিয়া এই বিদ্যাটা কলাবিদ্যা হিসাবে আয়ত্ব করিয়া

আসিবে। রঞ্জনকে তাহার ভাল লাগিয়াছে. কিন্তু বিলিতি-বিদ্যায় যাচাই করিবার অবকাশ পাওয়া চাই।

সুবোধ মিত্র বলে, মিলির রুচিও আছে, স্টাইলও আছে, তাহা ছাড়া আর যাহা আছে তাহাকে বিলিতি-মদের ঝাঁজের সহিত তুলনা করা চলে। বিগড়াইয়া না গেলে কেবলমাত্র এই ঝাঁজটুকুর জোরেই সে বিলিতি-মাটিতেও কম্পন আনিবে।

রঞ্জনের স্বর নামিয়া আসে। আপনাকে দেখে মনে হয়, এদেশের মাটি যেন আপনার জন্য নয়। একটা বিদেশী ফুলের গাছকে আনা হয়েছে জোর কোরে, তার খাদ্য যোগাচ্ছি তাকে তাজা রাখবো বোলে।

মিলি হাসিয়া বলে, "কিন্তু তাজা আমাকে রাখতে পারছেন না এই তো আপনার কথা ?"

"তাজা তো রাখা যায় না মিস মিলি,—এ যেন অক্সিজেন দিয়ে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা।"

মিলি হিঁ হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাল্কা মিহি সুরের হাসি,—এ হাসিও বিলাতি আমদানী।

রঞ্জনের চমক লাগে। চোখ বুজিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকে। বিলাতে সে যায় নাই, কিন্তু এখানে বসিয়াই যেন সে বিলাতি-মাটির গন্ধ পাইতেছে। মিলি তাহাকে ভুলাইয়াছে,—হাল্কা হাসির হাওয়ায় তাহার মন উড়িয়াছে প্যারিসের পথে। মিলির চুলের গন্ধে আছে সেই বাতাস। সে-চুল সোনালি কি কালো তাহার রূপটা পড়িতেছে না চোখে—সবটা মিলাইয়া যাহা চোখে আছে তাহাকে কল্পনা করা চলে, মিলি যেন আছে প্যারিসের রাজপথে হাল্কা হাসির মত।

এদিকে মিলির মনে হইতেছে, রঞ্জন যেন দম লইতেছে,—চাহিয়া দেখিল চোখ দুটাও দিয়াছে বন্ধ করিয়া। অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাণ্ড, চোখ বুজে আবার কি কুকাণ্ড ঘটাচ্ছেন ?"

"কোন কিছু ঘটাবার শক্তি আমার নেই, আমি বরং পণ্ড করতে পারি। তাছাড়া চোখ বুজে কোন কাণ্ডই করা যায় না।"

"হনুমান বোধ হয় লঙ্কাকাণ্ড করেছিলেন চোখ বুজেই।"

"অনুমানের কারণ?"

"নইলে অমন কোরে মুখ পোড়ে।"

"অর্থাৎ আমারও মুখ পোড়বার সম্ভাবনা আছে?"

"সত্যি বলুন না, চোখ বুজে কি ভাবছিলেন?"

"শুন্‌লে হাসবেন।"

"কথা দিলাম, হাসবো না।"

"তবে বলি শুনুন। আপনি পাশে আছেন,—আমি ভুলে যাই, এ প্যারিস না আমার সোনার বাংলা দেশ। আপনার চুলের গন্ধে আমি অনুভব করি বিলিতি-মাটির গন্ধ,—সে-চুল সোনালি কি কালো, চোখ চেয়ে দেখতে চাইনে। দেখলে, স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকে না। চোখ বুজে দেখা আর চোখ খুলে দেখা, দুটো এক জিনিস নয়, এ তো জানেন।"

"খুব জানি। চোখ বুজে ভগবানকে দেখতে পাওয়ার কথাও শুনেছি।"

"ভগবানের সঙ্গে এর তফাৎ এইখানে, ভগবানকে চোখ খুলে আর দেখা যায় না, কিন্তু আপনাকে যায়,—বাকিটা চোখ বুজে দেখতে হয়।"

মিলি আশ্চর্য্য হইয়া গেলো। স্তুতি সে এ-বয়সে অনেক শুনিয়াছে,—কিন্তু ইহাকে যেন স্তুতি বলিতে মন চায় না, সত্য নাও হইতে পারে, তবু সত্য বলিতে ইচ্ছা করে।

"চুপ কোরে আছেন দেখে মনে হচ্ছে কথাটা মনে লাগেনি।"

"আমি কি হৃদয়হীন রঞ্জনবাবু?"

"আচ্ছা, বলুন তো এ হাসি আপনি কোথায় পেলেন ?"

"এইবারে মুস্কিলে ফেললেন দেখছি! আমাকে যা দেখছেন, সমস্ত মিলিয়েই আমি। খণ্ডাংশের বিচার করতে বসলে আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া শক্ত হবে। তবে এই বলতে পারি, ভাল যদি লেগে থাকে তার দাম কষতে যাবেন না।"

"মিস মিলি মিটারের মুখে একথা আজ বেমানান হোলো। এ বলতে পারতো অবন্তিকা,—যে এদেশেরই মেয়ে।"

"অবন্তিকা কে ?"

"সেও একটি মেয়ে,—পড়াশুনা আছে কিন্তু সাহস নেই।"

মিলির মনটা দমিয়া গেলো। ইহার পর যত কথাই সে বলিতে যায় আগের সুরটি লাগে না।

রঞ্জন তাহার মুখ দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অপরিচিতার নাম কি মনে বিপ্লব ঘটালো ? আমিই অপরাধী, সন্ধ্যেবেলার সুর বিগড়ে দিলাম।

"একটুও না। যাকিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট কোরে বোলেও যে-সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর।"

"সাহস পেলাম তাই শুনিয়ে রাখি, অনেক মেয়ের সঙ্গেই পরিচয় ঘটেছে—যাদের জানা হয়েছে, চেনা হয়নি। এক কথায় পাকা পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি তারা।"

"আমি কি পাস করলাম ?"

"সময় হয়নি।"

"যাক্ ততদিন বিলেত থেকে ঘুরে আসতে পারবো আশা করি।"

এতদিন পরে রঞ্জন একটা কথা আবিষ্কার করিয়াছে, মিলি এদেশের যোগসূত্রকে ছিঁড়িতে পারিলেই যেন বাঁচে। সাগর-পারের মাটি হইতে

হয়ত কোন রত্ন খুঁজিয়া পাইবে এমনি বিশ্বাস আছে তাহার মনে। মিলির দাদাই উহার সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। বিলাতি এসেন্সের গন্ধ দিয়াছে ছড়াইয়া উহার পরিবেশের মধ্যে,—মন মাতিয়া উঠিয়াছে, এখন ঠেকায় কাহার সাধ্য।

রঞ্জনের মনেও লাগিয়াছে দোলা। ঝোঁক চাপিলে মিলির সহিত বিলাত পর্য্যন্ত দৌড়াইতেও পারে। এমনি যখন তাহার মনের অবস্থা, দেশ হইতে আসিল মায়ের চিঠি।

"খোকা, অনেক খবরই ঘরে ব'সে পাচ্ছি,—যাকে সত্য বলতে ইচ্ছে করে না, মিথ্যে বল্‌তেও পাচ্ছি না। এতদিন জানতাম অবন্তিকার কথা, আজ শুন্‌ছি কোন্‌ খৃষ্টান মেয়ে তোমাকে ভুলিয়েছে। তোমাকে শাসন করবার ভার একদিন গর্ব কোরে ওঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলাম, তোমার প্রতি উদ্যত খড়্গ এমন কোরে একদিন আমাকেই আঘাত করবে কে জেনেছিলো। ওঁর ক্রোধকে ভয় করিনে,—তোমাকে নিয়ে গাছতলায় দাঁড়াবো। মিথ্যা দিয়ে নিজেকে ভুলিও না। চোখ-ধাঁধাঁনো জৌলুস-করা জিনিসের দাম সৌখিন-সমাজে—তার জাত নেই। অবন্তিকা কেমন মেয়ে—তাকে চোখে দেখিনি, কিন্তু তাকে বুঝতে কষ্ট হয় না, যতই সে কলেজে পড়ুক। তোমার চেয়ে তার ভাবনাই এখন আমার বড় হয়েছে। এতবড় ফাঁকি সে সইবে কি কোরে ? তোমার কথা শুনতেও ভয় লাগে। তাও শুনবো, যদি সহজ কোরে বলো।

শুনছি কলিয়ারিতে আগুন লেগেছে। সর্বনাশ ঘটে ঘটুক, কিন্তু তুমি আর নতুন কোরে আগুন লাগিও না।"

চিঠিখানা হাতে করিয়া রঞ্জন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ইতিপূর্বে বে-আইনী করিয়া মার কাছ হইতে অনেক-কিছু সে আদায় করিয়াছে। মনে করিয়াছিল, বিলাত যাইবার পাথেয়টাও অমনি করিয়া আত্মসাৎ করিবে। তাহা আর হইল না। মনে মনে বলিল, ফিরিয়াই যাইব,—

যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিল সেই পথে। আবার যাত্রাবদল করিয়া বাহির হইতে হইবে,—গ্রহকে ঠেকাইব, না হয় নিজে ঠকিব।

বৈকালে অবন্তিকার বাড়ি আসিতেই সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেলো। রঞ্জন কাহাকেও কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া বলিল, নতুন এক্‌সপেরি-মেণ্টেও ফেল করলাম পিসীমা। দেখছি, পাস করা আমার অদৃষ্টে নেই।

অবন্তিকা দিলো জবাব। "ঘোড়ার সঙ্গে সমান তালে মানুষ কোন-দিনই দৌড়ুতে পারলে না,—অদৃষ্ট ওখানে নির্মম।"

"কিন্তু কোন খেলাতেই তো জিৎ হোলো না আমার।"

"সেটা নির্ভর করে খেলোয়াড়ের উপর।"

"তা ঠিক, শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। তাই মনে করেছি, এবারে যাত্রা-বদল কোরে আস্‌বো।"

দুজনের হাসিতে ঘর ভরিয়া উঠিল। রঞ্জনের প্রতি মহামায়ার মমতা ছিলো, তাই হাসিতে হাসিতেও তাঁহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল।

রঞ্জনের কথা থামিতে চায় না, বলে, পরীক্ষায় পাস আমি কর্‌বোই, ভাগ্য যত নিষ্ঠুরই হোক।

অবন্তিকা বিদ্রূপ করিয়া বলে, বাজি-বংশের এতে পুলকিত হবার কথা।

মহামায়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। অবন্তিকা হাসিল।

রঞ্জনের সংযম ছিলো অসাধারণ। বলিল, তোমার কাছে আমি হার মানতে পার্‌বো না, সে তুমি যেমন কোরেই বলো।"

"হার মানতে তো বলিনি, তবে জিতবার রাস্তাও ওদিকে নেই।"

"আমার রাস্তা আমিই নেবো খুঁজে বের কোরে।"

"অবন্তিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, তাই বোলে উঠ্‌লেন কেন, রাস্তা দেখতে তো এখনো বলিনি।"

"আমায় রাস্তা যিনি দেখাবেন, তিনি আছেন অলক্ষ্যে, তাঁকে ভয় করিনে। সেকথা যাক্, কিন্তু বসতেই যে হবে এমনই বা কি কথা। একদিন কথা ছিলো না প্রচুর, কিন্তু সময় ছিলো অনন্ত। আজ কথা উঠেছে জমে,—হাতে নাই সময়।"

"সুতরাং ?"

"সুতরাং এখান থেকেই নিলাম বিদায়।"

অবন্তিকা একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "বসে গেলে বোধহয় ভাল হোতো, পিসীমা খাবার তৈরি কর্‌ছেন।"

"পিসী-মাসীর দল চিরকালই খাবার তৈরি কোরে আসছেন, আমাদের প্রতি তাঁদের স্নেহের অন্ত নেই। পারলাম না আমরাই মানুষ হোতে। যাবার দিনে দুঃখ দিলাম,—নিজেও কম পেলাম না, এই কথাটা মনে রেখো।"

অবন্তিকা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যদিও ইচ্ছা ছিলো রঞ্জনকে ফিরায়,—সময় সে দিয়াছিলো, কিন্তু আজো পাইল না যাহা সে চাহিয়াছিল। ও যেন পালিশ-করা এনামেল, ভিতরের লোহা নির্মম এবং কঠিন। মানুষের দুঃখে অবন্তিকারও চোখ ছল্‌ছলাইয়া ওঠে। কিন্তু রঞ্জন যেন মানুষ হইতে স্বতন্ত্র। তাহার দুঃখের অভিব্যক্তিতে হাসি পায়। অবন্তিকা জানে, রঞ্জনের সকল কথাই অপরের কোটেসন। বিনাইয়া বিনাইয়া অপরের কথাকে নিজের কথা বলিয়া চালাইবার কসরৎ যেন। ও যেন নিজেকে সাজাইয়া রাখিয়াছে,—পরিপাটি তাহার জামার ভাঁজ, কোঁচানো ধুতি, পালিশ-করা জুতা।

রঞ্জনের আকস্মিক অন্তর্দ্ধান মহামায়াকে কম লাগিল না। ইচ্ছা ছিলো, এই লইয়া অবন্তিকাকে দুটা শক্ত কথা শোনাইয়া দেন। অবন্তিকাও তাহা বুঝিয়াছিল, তাই সে জানাইয়া দিল, উচিত-পাওনার চেয়ে বেশী দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।

"তা না-হয় বুঝলাম। তুমি যখন তর্ক করো তখন বুঝতে পারি তুমি অনেক বই-পড়া মেয়ে। কিন্তু শুধু বই-পড়া বিদ্যেয় চল্‌বে না, তোমার মনের কথা বলো। রঞ্জনের ফিরে যাওয়া সইবে, তাই বোলে তোমাকে ফেরাতেই হবে এমন কঠিন পণ নাই বা করলাম।

"পণ আমারও নেই পিসীমা। তবে নিজেকে ধরা দিয়ে ঠক্‌তে চাইনে। অবিরাম অজস্র কথা বলার নেশায় নিজেকে ও হারিয়েছে, তাও কি স্বাভাবিক হ'তে পারলে।"

"ঠক্‌তে আমিও বলিনে। তবে তোমার মনটাও তো আমার জানা চাই।"

অবন্তিকা একটুখানি হাসিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুরকে উপরে দেখা গেলো। মহামায়া সন্ত্রস্ত হইলেন। জ্ঞানাঙ্কুর নিজেই একটা আসন দখল করিয়া বলিয়া চলিল, "তার বড় অসুবিধে হচ্ছে নীচের ঘরে। বাইরের ঘর কাউকে বলতেও পারিনে, সময় নেই অসময় নেই লোকজনের যাতায়াতে বিব্রত হোয়ে উঠেছি। আর এও তো ভাল কথা নয়,—নিন্দে হোলে আমারই লাগবে গায়ে।"

মহামায়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি নীচে যাও ঠাকুরপো, যা ব্যবস্থা করবার আমি করবো।" বলিয়া তিনি যেন রাগ করিয়াই ভিতরে গেলেন।

অবন্তিকা বলিল, "আপনার অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে আমার দৃষ্টি রইলো কাকাবাবু।"

"দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বোলেই বিরক্ত হয়, বুঝ্‌তে পারলে বৌঠান আমাকে অমন কোরে বলতে পারতেন না।"

"পিসীমার হোয়ে আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি কাকাবাবু।"

"কাকাবাবু বোলে বুঝি আমাকে বুড়ো বানাতে চাও?"

অবন্তিকা হাসিয়া বলিল, "একটা কিছু তো বলা চাই। আপনাদের নিয়ে যে মুস্কিল।"

"না ডাক্‌লেই চুকে যায়।"

"বিনা সম্বোধনে চালানো ঠিক জোড়াতাড়া দেওয়ার মত। ওতে আপনাকেই করা হবে অপমান।"

"অপমান মনে করাটাই বোকামি। নাম ধ'রে ডাক্‌বার জন্যেই আমার বাপ-মা একটা নাম দিয়েছিলেন। লোকে সেটার সদ্ব্যবহার যাতে করে বরং সেইদিকে আমার লক্ষ্য থাকা উচিত।"

ভিতর হইতে পিসীমার ডাক আসিল। অবন্তিকা নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একদিন রঞ্জন বলিয়াছিল, জীবনে সেইটাই তো শোচনীয় সমস্যা অবন্তিকা, যে সময় অল্প। এই স্বল্প-কালটুকু প্রাচুর্য্যে ভরাইয়া তুলিতে হইবে এমনি সাধনাই প্রত্যেকের মধ্যে থাকা চাই; নইলে বিদায় লইবার দিনে ফাঁকিটা বড় বেশী বাজে।

মিলি মিটারকেও রঞ্জন নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। সে বড় বেশী ভাল্‌গার। খেলার মাঠে বা চায়ের টেবিলে বেমানান নয়। কিন্তু মন ভরিয়া উঠে কই? রঞ্জনের পাগল-মন, ছুটাছুটি করিতেই সময় বহিয়া যায়,—যখন চোখ পড়ে, দেখে, আয়ুর অনেকখানিই নিঃশেষে ঝরিয়া গিয়াছে।

রঞ্জন এমনি এক মুহূর্তে ছন্নছাড়ার মত দেশের বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। পুত্রগর্বে মাতার মন প্রসন্ন হইল। কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, রঞ্জনকে এমন ভেসে বেড়াতে দেবো না,—ওকে আটকাও।

বিহারীলাল রুক্ষস্বরে জবাব দিলেন, আটকাবার ক্ষমতা আমার নেই। লক্ষ্মীকেই পারলাম না রাখতে,—যিনি কুললক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী।

গৃহিনীর চক্ষুও সজল হইল। মনে গর্ব ছিলো তিনি এ-বাড়ির পয়মন্ত বৌ। একবার পাটের ব্যবসায়ে বিহারীলাল আশাতিরিক্ত মুনাফা পাইয়া গৃহিনীর ঐ খেতাব দিয়াছিলেন। তাই আজ লোকসানের মার বধূরই বুকে বেশী বাজিল।

বিহারীলাল বলিলেন, ছেলেকে বিশ্বাস কোরো না। ডাক দিয়ে যার সাড়া মেলেনি, আজ না-ডাকতেই সে আসে কোন্ লোভে?

•"শোনো কথা। ছেলে আসবে বাড়ি, অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করো।"

বিহারীলাল কিছু না বলিয়া কাছারি-বাড়ি আসিয়া বসিলেন। নায়েবকে ডাকিয়া জানাইলেন, বুড়া পাইয়া খোকা যেন তোমাকে বোকা বানাইয়া না চলিয়া যায়।

ইহার ফল হইল উল্টা। মাতার স্নেহ বেশীমাত্রায় পাইয়া রঞ্জন স্ফীত হইয়া উঠিল। একদিন স্পষ্ট করিয়াই বলিল, আমাকে বাধা দিতে যেয়ো না, অনর্থ হবে। তোমরা যাকে বিয়ে বলো, আমার কাছে তার কোনো অর্থ নেই। রোমান্সের বাঁধা-বরাদ্দ রাস্তা তোমরাই বাৎলে দেবে এ আমি মানতে রাজি নই। আমার রোমান্স—আমিই সৃষ্টি করবো। হয়তো, সময় লাগবে,—তা ব'লে হতাশ হ'লে চলবে না। এটা এক্সপেরিমেণ্টের যুগ,—নাই বা হোলো জয়। তার জন্যে ক্ষোভ করতে যাবো না কারো কাছে।

শুনলে ভয় লাগে। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট কোরেই না

হয় তোমাকে বলি। জোর কোরে কিছু করতে যেয়ো না, সময় দিলাম।

রঞ্জন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে চলিয়াছে পরীক্ষামূলক দুরূহ কাজে, তাহার অর্থ এতই শক্ত যে মাতৃ-হৃদয় তাহা মানিতে চায় না। তবু রঞ্জনের মনের মধ্য হইতে প্রকাণ্ড একটা ভার নামিয়া গেল—বহুদিনের ভার। মনে বল পাইল; বুঝিল স্নেহ না পাইলেও অর্থের অভাব হইবে না। বলিল, সব স্থির কোরেই বিদায় নিতে এসেছি। মোটা কোরে কিছু মুষ্টিভিক্ষা দাও, বিলেত থেকে ফিরে এসে তার চারগুণ টাকা তোমার হাতে তুলে দেবো।

মার চোখে জল দেখা দিলো। ছেলের কাছে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—বলিয়া গেলেন, দেবো—আমার যা কিছু আছে সব তোর হাতে দেবো।

গোড়ায় রঞ্জন ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল দিন পনেরোর মধ্যে কলিকাতায় ফিরিবে। কিন্তু কোনোদিক দিয়াই সে-ব্যবস্থা আর হইয়া উঠিল না। মার কাছ হইতে বিদায় লইবার পালাটা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু পিতার দরজা পর্য্যন্ত পৌছাইতে বিলম্ব ঘটিতেছে।

পিতার মনে ভয় ছিলো। তাই সকলের কাছ হইতেই তিনি পালাইয়া বেড়াইতেছেন। হয়তো তাঁহার মনে ছিলো মেয়াদি-কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ঐ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি শান্ত হইবে।

এদিকে রঞ্জন ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ছটফট করিতেছে। মনে আছে, গণনায় ভুল না হইলে মিলি মিটার এতদিন ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাই অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া একদিন সে কলিকাতা যাত্রা করিল।

বিহারীলাল বুঝিলেন, গিন্নীর সহিত পাল্লা দিতে গিয়া চালে ভুল করিয়াছেন। আর ভুলের পরিমাণটা যতই তাঁহার চোখে পড়িতেছে ততই তিনি :জ্বলিয়া উঠিতেছেন। হিসাবের খাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়াও থই পাইতেছেন না। সন্দেহ হইল, কিন্তু গোল কোথায় ঘটিয়াছে টের পাইলেন না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর যে-অধ্যায়টা একদিন ইচ্ছা করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আজ এতদিন পরে দেখি তাহার অনেক কথাই জমা হইয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি,—সংসারের আর পাঁচজনের মত তাহাকে যে আর দূরে রাখিতে পারিতেছি না ইহাই আজ বড় করিয়া বলিতে হইতেছে।

সৌদামিনীর এখন আর সে-বয়স নাই। একদিন যাহাকে লইয়া সে ঘর ছাড়িয়াছিল,—ভাল হোক্, মন্দ হোক্ তাহাকে মানাইয়া লইতেই সে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে। নিজের সন্তানকে মানুষ করিতে হইবে,—আরও দশজনের মত সেও যাহাতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে সেই চেষ্টাই সে করিয়াছে। কিন্তু বিহারীলালের ইচ্ছা ছিলো অন্যরূপ। তবে ইচ্ছা থাকিলেই ত হইল না, তাই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই অপোগণ্ডের সমস্ত ব্যয়ভার নীরবে বহন করিয়া আসিতে হইয়াছে।

তারপর পঙ্কজ বড় হইয়াছে, মানুষ হইয়াছে,—সৌদামিনীর দুঃখও ঘুচিয়াছে। যে-গ্লানি এতকাল ধরিয়া দিবারাত্র তাহাকে দংশন করিয়াছে, আজ সকলই সে ভুলিয়াছে। কর্ত্তব্য তাহাকে সকলই ভুলাইয়াছে।

বিহারীলাল বলিয়াছিলেন, টাকা-পয়সার জন্য ভাবিও না, ছেলেকে যেমন ইচ্ছা মানুষ করিও,—ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও আমি করিয়া যাইব।

তা ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন,—সোনারপুরের বাড়িখানা এবং ব্যাঙ্কেও লক্ষাধিক টাকা পঙ্কজের নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। পঙ্কজ ইহার কিছু কিছু জানিলেও সবটা জানিত না।

একদিন সে সমস্তই শুনিল। কিন্তু লইব না বলিয়া তখন ফিরাইয়া দিতেও পারিল না। তার প্রথম কারণ, মাকে সে ভালবাসিত,—কোনদিক দিয়াই সে একথা ভাবিতে পারে না, মা তাহার প্রতি অবিচার করিয়াছেন, বরং এই কথাই তাহার মনে হইয়াছে, যেখানে ইচ্ছা করিলেই আবর্জনার মত তিনি পৃথিবীর যে-কোন কোণে তাহাকে ঠেলিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না-করিয়া যথার্থ মায়ের মত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতা দিয়াছেন,—নিজের সমস্ত পরিচয়কে তুচ্ছ করিয়া দিয়া যাহা সত্য তাহাই প্রকাশ করিতে কোনদিন লজ্জিত হোননি। এতবড় মা'র অসম্মান করিবে সে কোন্ মুখে? তা ছাড়া সৌদামিনীর দুঃখও তো কম নয়। ভুল করিয়াই হোক্ বা ভালবাসিয়াই হোক্ যাহার জন্য আত্মীয়স্বজন সমাজ সংসার সবকিছু তুচ্ছ করিয়া যে চলিয়া আসিতে পারিল, সে ভাল করিল কি মন্দ করিল সে মীমাংসা আজ না হয় থাক্, কিন্তু যাহার জন্য সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিল, সে তাহার কতটুকু মর্য্যাদা দিল,—নারীত্বের এত বড় অবমাননা, পুরুষ হইয়াও পঙ্কজ সহিতে পারে না। তাই বিহারীলালের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা থাকা সত্ত্বেও, মাতৃভক্তির কাছে সবকিছু হার মানিয়াছে।

এম-এ পরীক্ষা দিয়া পঙ্কজ বাড়ী আসিল বটে, কিন্তু শান্তি পাইল না। সৌদামিনী তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না।

এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। একদিন খবর আসিল,

বিহারীলালের নূতন কারবারে সর্ব্বস্ব গিয়াছে। মাকে ডাকিয়া কহিল, এ সময়ে আমি কি কিছু করতে পারি না মা ?

"না বাবা, তিনি তো চাননি।"

এই কথা পঙ্কজকে চাবুকের মত প্রহার করিল। হাত পাতিয়া দান গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু বিপদের দিনে তাহারা কোন সাহায্যেই লাগিবে না, এই আত্মাবমাননা রক্তমাংসের শরীর লইয়া পঙ্কজ সহ্ই বা করিবে কিরূপে ? পিতৃপরিচয় তাহার আছে কিন্তু সে-পরিচয় সমাজ স্বীকার করে না, অথচ মানুষ হইয়া সেই সমাজের বাহিরে মানুষের মতই তাহাকে বাঁচিতে হইতেছে। বিহারীলালের উঁচু মাথা হেঁট হইবে কিন্তু যে নিচু-মাথা লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কথা কহিবার অধিকারকেও খাটো করিতে হইবে, নহিলে ছোটোমুখে বড় কথার মত শোনাইবে, মানুষের এত বড় অসম্মান আর আছে নাকি ?

পঙ্কজের বড় দুঃখ মাকে সব কথা বলিতে পারে না, বলিলেও হয়ত ঠিকমত বুঝিতে পারিবেন না, বুঝিলেও তাঁহাকে ব্যথাই দেওয়া হইবে তাই মুখ ফুটিয়া বলিবার চেষ্টাও সে কোনদিন করে নাই। শুধু কহিল, পাশ কোরে এবার কলকাতায় বাসা করবো।

সৌদামিনী বুঝিল। তাই উত্তর দিল, বেশ, তাই হবে।

কথাটা ঐখানেই চাপা পড়িয়া যাইত, যদি না পঙ্কজের পাশের খবর বাহির হইয়া পড়িত। সকলের সঙ্গে সৌদামিনীও একদিন শুনিল, পঙ্কজ এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে। কিন্তু এককথায় কলিকাতাতেই বা সে যাইবে কি করিয়া ? যাইতে হইলে বিহারীলালের অনুমতি ভিন্ন যাওয়া চলে না, অথচ পুত্রের ইচ্ছাতে বাধা দিতেও প্রাণ চায় না,—অবশেষে পঙ্কজই একদিন ইহার সমাধান করিয়া দিল। স্থির হইল, পঙ্কজ উপস্থিত একাই কলিকাতার মেসে থাকিয়া চাকরির চেষ্টা করিবে, পরে সুবিধা হইলে মাকে লইয়া যাইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পঙ্কজ মনে মনে অসংশয়ে অনুভব করিতেছিল যে, কথাটা মা যেমন করিয়াই উড়াইয়া দিক, তাহার এত বড় আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করিতে কিছুতেই পারিবে না, তাই নিশ্চিন্তমনে কলিকাতায় আসিয়া সে চাকরির সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় যেসব বড় বড় স্বপ্ন তাহার মগজে বাসা বাঁধিয়াছিল, আজ ব্যবহারিক জীবনে তাহা একটি একটি করিয়া ক্রমশঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তবু পঙ্কজ দমে না, সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া সে তাহার পুরাতন মেসে ফিরিয়া আসে। এমনি করিয়াই কাটিতেছিল, দৈবক্রমে জ্ঞানাঙ্কুরের সহিত পথে একদিন দেখা হইয়া গেল। জ্ঞানাঙ্কুর সোনারপুরের ডাক্‌সাইটে লোক, কিছু জমিজমা এবং তদনুরূপ টাকা সুদে খাটাইয়া জমার অঙ্ক ও স্বীয় দেহের পরিধিকে সে ইদানীং বেশ একটু ফাঁপাইয়া তুলিয়াছিল। কেন যে অকারণ এই বছর-দুয়েক হইতে সে হঠাৎ গা ঢাকা দিয়াছে তাহার হদিস কেহ পায় নাই বটে, তবে মোটারকম একটা দাঁও মারিবার জন্যই যে কোথাও সে গিয়াছে ইহা সকলেই অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কারণ, লোকসান করিয়া বা সখ করিয়া জ্ঞানাঙ্কুর কোথাও বেড়াইতে বাহির হইবে ইহা যেমনই অস্বাভাবিক তেমনই অসম্ভব। আর সত্য কথা বলিতে কি, জ্ঞানাঙ্কুর বেড়াইতেও আসে নাই। লোকমুখে অবন্তিকার সংবাদ সে রাখিত, ভ্রাতৃজায়ার সহায়তায় এতবড় একটা সকন্যা রাজত্ব পাবার লোভ কিছুতেই ছাড়িতে পারে নাই। কিন্তু যাহার সাহায্য পাইবে বলিয়া সে আসিয়াছিল,—আসিয়া দেখিল, সেখানে চালাকি করিয়া জিতিয়া যাইবে এরূপ কোন সম্ভাবনাই নাই। তবু যে হাল ছাড়িয়াও জ্ঞানাঙ্কুর এখানে রহিয়া গেল ইহার কারণ মোচড় দিয়া কিছু বাগাইবার চেষ্টা,—ভরাডুবির মুষ্টিলাভ!

বহুদিন পরে পঙ্কজকে দেখিয়া জ্ঞানাঙ্কুর সত্যই খুসী হইল, কারণ, অসময়ে সে বন্ধুর মত আসিয়া পড়ায় এবং তাহাকে তাহার প্রয়োজনে অনায়াসে নিয়োগ করিতে পারিবে মনে করিয়া সে আর-এক নূতন চাল চালিয়া বসিল।

বলিল, কোথায় উঠেছো হে ? চল না, আমার বাসা নিকটেই, তবু কথা ব'লে দুদণ্ড আরাম পাবো।

আরাম দিবার মত তাহার মনের অবস্থা নয়, তবু বলিল, চলুন, অন্তত বাসাটাও দেখে আসা হবে।

"দেখ ভায়া, এদেশে লোক নেই,—এই তো এতদিন আছি, প্রাণ খুলে কথা বলতে কাউকে দেখলাম না। সবাই আছে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, এর চেয়ে বনে বাস করা ভাল।"

বনে বাস করা ভাল কি মন্দ, পঙ্কজের সে-সম্বন্ধে কোন উদ্বেগই নাই, হাসিয়াই বলিল, হাঁ কলকাতা ঠিক আমাদের জন্য নয়। কিন্তু কোথায় আপনার বাসা, দেখতে দেখতে যে অনেকখানি এসে পড়লাম।

এই যে এসে পড়েছি ভায়া, ঐ লাল বাড়ীটার পাশেই।

পঙ্কজ বিস্মিত হইল। এত বড় বাড়ী কাহার এবং কোন্‌সূত্রে জ্ঞানাঙ্কুর এখানে আছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সে অবাক হইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। জ্ঞানাঙ্কুর জানাইয়া দিল, এখানে তাহার বৌঠান থাকেন। বার বার তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে—বুঝলে না ভায়া, তা বেশ আছি—দিব্যি আহারটা হচ্ছে, কোলকাতা সহর আনন্দেই কাটছে।

পঙ্কজ সমস্তই বুঝিল, কিন্তু এই কথাটাই বুঝিল না যে কে তাহার বৌঠান এবং এতদিনই বা তিনি ছিলেন কোথায়, আর কেনই বা এতদিন পরে এই বিপত্নীক দেবরটির প্রতি সদয় হইলেন।

জ্ঞানাঙ্কুর কিন্তু এইটুকু মাত্র জানাইয়াই ক্ষান্ত হইল না, বলিল, বড়দা

মারা যাবার পর থেকেই বৌঠান তাঁর এই দাদার বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী নাই, একটিমাত্র মেয়ে,—তাই দেখাশোনা করবার জন্যে—আমি মত দিলাম ভায়া, আমি কোথায় থাকি, কোথায় না—

কথা শেষ না করিয়াই আবার বলিল, ভাইঝিটি দেখতে বেশ, এবার এম-এ তে সেকেণ্ড হয়েছে। তুমি হয়েছো ফার্ষ্ট, সে হয়েছে সেকেণ্ড,—তোমার পরিচয় বলেছি তাকে।

সেকেণ্ড হয়েছে,—কি নাম বলুন তো?

অবন্তিকা। আমি বলেছি আমার বৌঠানকে, যদি ভগবান দিন দেন তবে দেখাবো আমাদের পঙ্কজ ভায়াকে—তোমার নাম তো এবাড়ীর চাকরগুলোও জানে।

"বলেন কি!"

"গেজেটে নাম বেরিয়েছে ভায়া, এ আর কত চাপা দেবে। তোমাকে দেখতে—বল্‌লে বিশ্বাস করবে না, কাতারে কাতারে লোক এই বাড়ীর দরজায়, আমি যত বলি সে এখানে নেই বাপু, ওরা ততই ভীড় ক'রে জ্বালাতন করে।"

"কেন, ফার্ষ্ট কি আমার আগে কেউ হয়নি নাকি?"

"হবে না কেন, তবে কি জান ভায়া,—চোখের উপর রক্তমাংসের সেই মানুষটাকে দেখা—

পঙ্কজ হাসিল। বলিল, "তা বটে। কিন্তু আপনাদের অবন্তিকাও কি এ সব অত্যাচার বরদাস্ত করেছেন?"

জ্ঞানাঙ্কুর এইবারে সব দাঁত কয়টি বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর গলা নামাইয়া বলিল, "তার আগ্রহও কম নয় ভায়া, তোমার সঙ্গে আলাপ করবে ব'লে আমাকে—"

"আচ্ছা, চল্‌লাম জ্ঞানাঙ্কুর দা," বলিয়া পঙ্কজ যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

"আরে ব'সো ব'সো। তোমার কোনো কথাই যে শোনা হ'লো না, কি করছো? কলকাতায় কবে এলে?"

"কিছুই করিনি, তবে চাকরির চেষ্টা করছি।"

"চাকরির জন্যে তোমাকেও চেষ্টা করতে হয়? তবে এম-এ পাস করার মূল্য কি, আর ফার্ষ্ট হওয়াই বা কেন?"

"কোনো মূল্য নাই জ্ঞানাঙ্কুরদা, কোনো মূল্য নাই। সং সেজে ফটো নেওয়াই সার হয়।"

এমন সময় অবন্তিকার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল বাড়ীর দরজায়। অবন্তিকা গাড়ী হইতে নামিতেই জ্ঞানাঙ্কুর পঙ্কজের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, "এই আমাদের পঙ্কজ ভায়া।"

অবন্তিকা উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "আপনার কথা কাকাবাবুর মুখে অনেক শুনেছি—

"হাঁ, আপনার কথাও এইমাত্র হচ্ছিলো।"

"আচ্ছা একটু বসুন, পালাবেন না যেন।" বলিয়া ক্ষিপ্রপদে অবন্তিকা উপরে উঠিয়া গেল।

অবন্তিকা চলিয়া যাইতেই জ্ঞানাঙ্কুর চারিদিক একবার দেখিয়া লইয়া চাপা গলায় বলিল, একটা কথা বলে দি ভায়া, আলাপ যখন হোয়ে গেল, চাকরির কথাটা ঐ সঙ্গে বলতে ভুলো না। বড়লোকের মেয়ে, কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা—বুঝলে না ভায়া!"

"হাঁ, তা বুঝেছি, কিন্তু ধনী-কন্যার সুপারিশে যদি আমাকে চাকরি জুটিয়ে নিতে হয়, সে চাকরি আমার না-করাই ভাল।"

জ্ঞানাঙ্কুর কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "ওতে লজ্জা নেই ভায়া, তোর পায়ে পড়ি, না তোর কাজের পায়ে পড়ি। আর তোমাকে তো উনি অনুগ্রহ করছেন না,—কত বড় কোয়ালিফিকেসন তোমার—তোমাকে যে লুফে নেবে হে ভায়া।"

লুফিয়া লইবার লোভনীয় আলোচনার মস্তকে বজ্র হানিয়া অবন্তিকা নীচে নামিয়া আসিল। বলিল. আসুন, উপরে আসুন।

যে-ধারাবাহিক জীবনের সঙ্গে পঙ্কজ পরিচিত, সেখানে অবন্তিকা কিছুমাত্র আড়ম্বর না করিয়া অতি সহজে তাহাকে আহ্বান করিতে পারিল দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের আর অবধি নাই। অথচ কিছু আগেই এই ধনীকন্যা সম্বন্ধে তাহার কত কথাই না মনে জাগিয়াছিল এবং এই অপরাধের জন্য যে শেষপর্য্যন্ত তাহাকে ইহার নিকট ক্ষমা চাহিয়াই বিদায় লইতে হইবে, ইহাও সে মনে মনে আঁচিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু উপরে আসিয়া অবন্তিকা প্রথম যেকথা বলিল, তাহাতে পঙ্কজের আর বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

অবন্তিকা বলিল, প্রথমেই আপনার কাছে আমার ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে, আমার অপরাধের তো আর অন্ত নেই, কি ভুলই যে করেছি সে আমিই জানি।

পঙ্কজ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বলের মত অবন্তিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবন্তিকা হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, কেবল ফার্ষ্ট হোতেই জানেন দেখছি, মেয়েদের মুখের দিকে অমন কোরে কেউ চেয়ে থাকে না কি?

"তা না হয়, না থাক্‌লাম, কিন্তু কথাটা কি? আপনার অপরাধই বা কোথায় আর মিছিমিছি আমাকেই বা ক্ষমা করতে হবে কেন?

"মিছিমিছি নয়,—সত্যিই আমার অপরাধের অন্ত নেই। কাকাবাবুর মুখে আপনার নাম যতবারই শুনেছি, আমার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তাই ব'লে আপনার প্রতি যে আমার কোনোরূপ বিদ্বেষ—আপনি রাগ করবেন না, কি জানি কেন আপনাকে আমি কোনদিনই সহ্য করতে পারিনি। হয়ত একে ঈর্ষা বলতে পারেন, কিম্বা—

"কিম্বার কথা থাক্। কিন্তু আজই বা আপনি আমাকে এতটা সহ্য করলেন কি কোরে? ঈর্ষার কারণ তো আজও আছে।"

"তা হয়ত আছে। কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হোলো, ঈর্ষাই করি আর যাই করি, আপনাকে অপমান করতে পারি না। তাছাড়া ঈর্ষাই বা করতে যাবো কেন? প্রতিযোগিতায় কোনোদিক দিয়েই যে আমি আপনার সমান হোতে পারি না, সে আপনাকে কাছাকাছি পেয়ে এতদিনে বুঝতে পারছি। কিন্তু আর কথা নয়,—বলুন, ক্ষমা করলেন?

"কি আশ্চর্য্য, মিছিমিছি ক্ষমা করতে যাব কেন?

"না, মিছিমিছি নয়। একদিন বুঝবেন, আমি যা বলেছি তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। ঐ ক্ষমাটুকু চেয়ে নেবার জন্যেই আপনাকে কষ্ট কোরে আজ আট্‌কে রেখেছি।

"নইলে কি আট্‌কে রাখতেন না?

"সেকথার মীমাংসাও আজ না হয় থাক্। যদি কোনোদিন সময় আসে সেদিন বলবো। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারী লজ্জা করছে, আপনি কি মনে করছেন জানি না, অন্যে হ'লে কিন্তু আমাকে নির্লজ্জই বল্‌তো।"

"বেশী কথা এবং স্পষ্ট কথা বললেই আমাদের দেশের মেয়েদের জাত যায়। অন্যের কথা জানি না, আমি কিন্তু সেইসব মেয়েকেই বেশী ভালবাসি।"

অবন্তিকার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, যাই হোক্, কিছু মনে করবেন না, আমি বড্ড বেশী বকি।

"আমাকেও বড় বেশী নিরীহ মনে করবেন না। কিছু পুরোনো হোলেই দেখতে পাবেন, আমি অতিমাত্রায় অভদ্র।"

"আর আপনিও পরে দেখতে পাবেন, যারা বিনিয়ে বিনিয়ে কথ

বলে, যারা নিজেকে ধরা দিতে জানে না, যারা কৃত্রিম আবহাওয়াকে নিজেরাই সৃষ্টি কোরে কোরে চলে,—যাদের হাসি মিথ্যে, যাদের মুখের কথার সঙ্গে মনের কথার এতটুকু মিল নেই, তাদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে।"

পঙ্কজ উচ্চস্বরে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। অবন্তিকা চম্‌কাইয়া উঠিল, মানুষ এত জোরে হাসিতে পারে!

পঙ্কজ বলিল, আপনি ঠিকই বলেছেন, এরকম মানুষ আমি দেখেছি।

কিছুক্ষণের জন্য অবন্তিকা বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাহার দিক হইতে কোনো উত্তরই পাওয়া গেল না। এমন করিয়া যে কতক্ষণ কাটিল তাহার হিসাবও কেহ করিল না, তারপর যখন হুঁস হইল তখন ব্যস্ত হইয়া কহিল, বসুন, চা নিয়ে আসি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অবন্তিকা চা লইয়া আসিল। পঙ্কজ মৃদু হাসিয়া কহিল, চা-এর জন্য ব্যস্ত হবার কি প্রয়োজন ছিলো?

"কই, নিষেধও তো করেননি।"

"তার কারণ আপনারও তো প্রয়োজন থাকতে পারে।"

"এ আপনার বিনয়ের কথা। আপনি বেশ জানেন, আমি নিজের খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হোয়ে পড়িনি, তবু নিজে হার মানবেন না, এমনি আপনাদের স্বভাব।"

"তা সত্যি, হার মানতে আমরা জানি না। বিশেষ কোরে মেয়েদের কাছে হেরে যাব, এ কল্পনা করতেও আমরা রাজি নই।"

"এই কথা তো? কিন্তু দেখবেন, একদিন আপনাকে হার মানতেই হবে, এও আমি জানিয়ে রাখলাম।"

"হার যদি মানতেই হয়—অবশ্য আপনার কাছে, সেদিন দেখবেন হিসেবের অঙ্কে আমিও বড় কম লাভ কোরে বসিনি, একথাও আপনাকে ব'লে রাখলাম।"

চায়ের বাটি শেষ করিয়া পঙ্কজ উঠিয়া পড়িল এবং বিদায় লইবার সময় এই কথাই বলিয়া গেল, অনেক বিরক্ত কোরে গেলাম, কিছু মনে করবেন না।

"মনে করবো যদি না আবার এমনি বিরক্ত করতে আসেন।" তারপর হাসিয়া বলিল, "সত্যি, আসবেন তো ?"

"সময় পেলেই আসবো, এইটুকু মাত্র বলতে পারি।"

"তার বেশী পারেন না ?"

"কি কোরে পারি বলুন। শেষে আপনিই একদিন অপবাদ দেবেন, আমার কথার ঠিক নেই ব'লে। তার চেয়ে কোনো প্রতিশ্রুতিই দিলাম না আমরা কারু কাছে। অযাচিত, অপ্রত্যাশিত যে-পাওয়া তার মধ্যে মাধুর্য্যও আছে, আনন্দও আছে,—নয় কি ?"

মুখ-চোখ লাল করিয়া অবন্তিকা ঘামিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঢোক গিলিয়া বলিল, হাঁ!

ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া পঙ্কজ সেদিনের মত বিদায় লইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মাসখানেক গত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পঙ্কজ একটি কলেজের প্রফেসরি জুটাইয়া লইয়াছে, ছোটোখাটো বাসাও একটি করিয়াছে,—তবে সুবিধা হয় নাই বলিয়া মাকে লইয়া আসিতে পারে নাই, মাও জানাইয়াছেন শীতটা কাটাইয়া কলিকাতা আসিবেন।

এদিকে সময় এবং সুবিধা না হওয়ায় পঙ্কজ অবন্তিকারও কোনো খোঁজখবর লইতে পারে নাই। চেষ্টা করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরবাবুও তাহার

কোনো সন্ধান পায় নাই। কিন্তু কাহাকেও কোনো খবর না দিয়া একদিন অকস্মাৎ অসময়ে পঙ্কজ অবন্তিকার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অবন্তিকা বলিল, খুব চমৎকার তো!

আর দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়া পঙ্কজ কহিল, দেখুন, দেরি কোরে আসার এই মাধুর্য্য। সকলকে বিস্মিত কোরে দিয়েছি, সুলভ হোলে আপনার মুখে এই ব্যাকুলতার সুরও ফুটতো না, এতখানি আনন্দও পেতেন না।

অবন্তিকা আরক্ত হইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল।

পঙ্কজ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াই চলিয়াছে, এই যে ঘড়ি ঘণ্টা দিন রাত্রির সময় নিয়ে কাড়াকাড়ি, এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ুতে পারি এমন বুকের জোর আমার নেই। সময় পেলাম তো জোর কোরে কিছুটা কাজ আদায় কোরে নিলাম, আর না পেলাম তো নিশ্চিন্ত হোয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে গেলাম। কৈফিয়ৎ নেবার কেউ নেই, দেবার গরজও দেখি না।

"দেবার গরজ অবশ্য আপনার, কিন্তু সত্যিই কি আপনার এ কদিন সময় ছিলো না, না ইচ্ছে কোরেই নিজের গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেছিলেন?"

এইবারে পঙ্কজ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, গম্ভীর হবার চেষ্টা সত্যিই যে এক-এক সময় না করেছি এমন নয় কিন্তু কিছুতেই ওটা আর আয়ত্ব করতে পারলাম না। অথচ ওর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি সে আমার চাইতে আর কে জানে। ক্লাসের ছেলেরা মানে না,—এক-কালে সাহিত্য করেছি, সেই কথা তুলে আমাকে এমনি মাতিয়ে তোলে যে পড়ানোর কথা ভুলে যাই।

"বেশ মজা তো! কিন্তু সাহিত্যের ভূত এখনো আছে, না গেছে?"

"না, সে আর নেই। ভাগ্যিস, আমি তাকে ছেড়েছি, নইলে সেই আমাকে পেয়ে বসতো।—অত বড় পাগলামি আর নেই কিনা।"

"নেই নাকি ?" বলিয়া অবন্তিকা অকারণে হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

"কিন্তু হঠাৎ আপনিই বা এতটা উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলেন কেন, বুঝলাম না। সাহিত্য করা নিন্দেরও নয়—আর তা নির্ব্বুদ্ধিতাও নয়।"

"না, তা নয়। যাক্ সে কথা, এবার আমার একটা উপায় কোরে দিন তো। ব'সে ব'সে সময় কাটে না—এতদিন পড়াশোনা নিয়ে ছিলাম, আপনার মত চাকরি কোরে যে সময়ের সদ্ব্যবহার করবো তারও উপায় বোধ হয় ভগবান দেননি। তবে কি করি বলুন,—সাহিত্য করবো ?

"সর্ব্বনাশ! অমন কাজও করবেন না,—তাছাড়া আপনি চাকরি করবেন কি !"

"ঐ তো বললাম, ইচ্ছে থাক্‌লেও আপনারা কি আর করতে দেবেন ! কিন্তু চাকরি না হয় না-করলাম, একটা সুপরামর্শ তো দেবেন।"

"কিন্তু আপনার মত অবস্থা যদি আমার হোতো,—অর্থাৎ খাওয়া-পরার ভাবনা থাক্‌তো না, তাহ'লে নিশ্চিন্ত-আলস্যে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে, —চাকরি যারা করে তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতাম।"

কথা শুনিয়া অবন্তিকা একটা প্রবল হাসির বেগকে অতিকষ্টে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "সত্যি বলছি, একটা কাজ দিন।"

পঙ্কজের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জোগাইল, বলিল, "তাড়াতাড়ি বিয়ে কোরে ফেলুন,—কাজের আর কূলকিনারা পাবেন না—

কথাটা শেষ করিয়াই দেখিল, অবন্তিকা উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। পঙ্কজ বুঝিল, একথা তাহার বলা উচিত হয় নাই। এই কথার মাত্রা রক্ষা করিয়া চলিবার মত বুদ্ধি পঙ্কজের কোনোদিনই হইল না। এবং এই কারণে নানাস্থানে তাহাকে বিব্রতও হইতে হইয়াছে। তথাপি তাহার এই অভ্যাস গেল না।

একটু পরেই মহামায়াকে লইয়া অবন্তিকা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। পঙ্কজ মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কিন্তু কিছু বলিল না।

অবন্তিকা হাসিয়া বলিল, "রাগ করেছেন বুঝি ?"

"রাগের কারণ তো কিছু ঘটেনি, বরং আমিই অপরাধ কোরে ফেলেছি। তা না হয় হোলো, কিন্তু উনি ? ওঁকে তো চিনলাম না।"

"আমার পিসীমা। সেদিন অসময়ে এসে পড়েছিলেন ব'লে উনি পূজো ছেড়ে উঠতে পারেননি।"

পঙ্কজ নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া মহামায়াকে প্রণাম করিল। মহামায়ার সেদিকে লক্ষ্য ছিলো না—তাঁহার মুগ্ধ-চোখের পলক আর পড়িতে চাহে না, বিধাতাপুরুষ যেন কুঁদিয়া কুঁদিয়া ইহার মুখাবয়ব গড়িয়া তুলিয়াছে। সে-মুখে সৌন্দর্য্যের অলৌকিকত্ব হয়ত ছিল না, তথাপি কেমন করিয়া যেন তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন একটা বিস্ময়কর বস্তু এইমাত্র তাঁহার চোখে পড়িল, যাহা এতদিন কোথাও দেখেন নাই।

অবন্তিকাও পিসীমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। বলিল, একটু চা কোরে দাও না পিসীমা, উনি আবার উঠতে চাইলে ওঁকে আটকায় কার সাধ্য।

মহামায়া চলিয়া গেলে, অবন্তিকা হাসিয়া পাশে বসিল, বলিল, "পিসীমাকে কেমন লাগলো ?"

"পিসীমাকে যেমন লাগা উচিত তেমনিই লাগলো। কিন্তু কেন বলুন দেখি, হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন ?"

"কি মুস্কিল, এও কি জিজ্ঞাসা করতে পারবো না ? অনেকে বলে কিনা পিসীমা সুন্দরী।"

"ছি ছি, এ রকম আলোচনা আপনার পিসীমার কানে গেলে তিনি আর আমার মুখদর্শন করবেন না। আপনি অন্যকথা বলুন—"

অবন্তিকা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কথার মোড় ফিরাইল। বলিল, "আমার কাজের ব্যবস্থা তাহ'লে করলেন না ?"

"আবার সেই কাজের কথা! দেখুন, এইবারে সত্যিই আমি রাগ কোরে চ'লে যাবো। শুনবার ইচ্ছেও আছে, অথচ কিছু বলতে গেলেই চটে যাবেন।"

"চটবার কথা বললে কে না চটে বলুন।"

"বিয়ের কথায় চটে, এমন মেয়ে তো কখনো দেখিনি।"

"আপনি দেখেননি ব'লেই যে ত্রিভুবনে অমন মেয়ে থাকতে নেই এই বা আপনাকে কে বললে ? তা ছাড়া সে-সৎপরামর্শ দেবার জন্মে কোনোদিন আপনাকে ডাকতে যাব না।"

"নাঃ, সত্যিই চটেছেন দেখছি।" দরজার সম্মুখে মহামায়াকে চা লইয়া আসিতে দেখিয়া পঙ্কজ বলিল, "আচ্ছা, পিসীমাই বিচার করুন, আমি অন্যায় বলেছি কিনা ?"

মহামায়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমি তো গোড়ার কথা কিছুই জানি না।"

পঙ্কজ বলিল, কথামাত্র একটি, এর জন্য আদ্যোপান্ত শুনবার দরকার হবে না। উনি বলছিলেন, পড়াশোনা ছেড়ে কিছু কাজ না পেয়ে বড় বিশ্রী ঠেক্‌ছে। আমি বললাম, তাড়াতাড়ি বিয়ে কোরে ফেলুন, কাজের আর অন্ত পাবেন না। আপনিই বলুন, কিছু অন্যায় বলেছি কি ?"

"কথা তো মিথ্যে নয়, মেয়েমানুষের ওর চেয়ে বড় কাজ আর নেই। নিজের সংসারে খাটতে পাওয়ার আনন্দ যে কতখানি সে মেয়েরাই জানে।" বলিতে বলিতে মহামায়া একটি চাপা নিশ্বাস গোপন করিলেন।

"যাক্, নিজের পক্ষে 'রায়' পেয়ে এবার খুসী হোলেন তো ? এখন চা-টা খেয়ে ফেলুন দয়া কোরে, নইলে ওটা আবার ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে

কিনা। বাবা রে বাবা, কাকাবাবু আচ্ছা লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন,—ফার্ষ্ট যেন আর ত্রিভুবনে কেউ কথনো হয়নি।"

"ত্রিভুবনে ফার্ষ্ট হয়ত অনেকেই হয়েছে কিন্তু পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় আর দ্বিতীয় পাবেন না।" তারপর চায়ের বাটি শেষ করিয়া বলিল, "আপনি ফার্ষ্ট হোতে পারেননি ব'লে দুঃখ করবেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই,—সেকেণ্ড হোয়েও আপনার দেমাক্ কিছুমাত্র কম দেখছি না!"

"ওমা, দেমাক আবার আমার কোথায় দেখলেন! আপনার মুখে কিছু আটকায় না দেখছি!"

"মুখের সংযম আপনিই বা রাখতে দিচ্ছেন কই?"

এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নীচে হইতে হাঁক দিল, পঙ্কজ এসেছো না কি ভায়া?"

"আজ্ঞে হাঁ, এসেছি।" বলিয়া পঙ্কজ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

"আহা, বসুন না। দুদণ্ড দেরী হোলে কাকাবাবুর সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে না।"

"না, তা হয়ত হবে না, কিন্তু আজ উঠি।"

এই বলিয়া পঙ্কজ একরকম জোর করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সে বৎসরও বিহারীলাল পাটের ব্যবসায়ে তেমন সুবিধা করিতে পারিলেন না। উপর্য্যুপরি দুই তিন সন তাঁহাকে লোকসান দিয়া বাজারের সুনাম রক্ষা করিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহার উপর কয়লা-খনির দুর্ঘটনায় তিনি একেবারেই মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বের সে বয়সও নাই, উৎসাহও নাই। পরিশ্রম করিবার শক্তি নাই বলিয়াই হউক বা পড়তা খারাপ পড়িয়াছে বলিয়াই হউক, তিনি যে আর উঠিতে পারিবেন এরূপ ভরসা নাই। গিন্নী বলিয়াছেন, আর নষ্ট করিয়া কাজ নাই, যাহা আছে তাহাই নাড়িয়া চাড়িয়া শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া দাও, —শেষে কি সব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব ?

কথা মিথ্যা নয়। এরূপ আর বছর কয়েক হইতে থাকিলে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িবে। এদিকে রঞ্জনেরও কিছুদিন হইতে কোন সংবাদ নাই। সে যে কোথায় কি-ভাবে আছে তাহাও জানিবার উপায় নাই। সদর কাছারিতে এক বুড়া নায়েব ছাড়া পুরাতন কর্ম্মচারি আর প্রায় কেহই নাই। দেবাইপুরের কাছারি জনশূন্য; গোমস্তা রামচন্দ্র যাহা পাইতেছে তাহাই লুটিয়া পুটিয়া খাইতেছে,—কেহ দেখিবারও নাই। আর দেখিবেই বা কে? দেখিতে হইলে নিজেকেই ছুটিতে হয়, কিন্তু ছুটাছুটি করিয়াই বা কতদিক রক্ষা করা চলে! তাই অবসর বুঝিয়া বিহারীলাল একদিন নায়েবকে ডাকাইয়া বলিলেন, মল্লিক, আর কেন,—অনেকদিন চুটিয়ে জমিদারী করা গেল, নিলেমে উঠবার আগে ওগুলো বিক্রী ক'রে দাও। দেবাইপুরের খবর কিছু পেয়েছো?"

"শুনলাম, প্রজারা এসে কাছারিতে গোমস্তাকে শাসিয়ে গিয়েছে।"

"তোমার গোমস্তা রামচন্দ্র কি বলে? তোমার কাছারিতে কেউ কি নেই যে তাকে ধ'রে আনতে পারে?"

"ধ'রে হয়ত আনা যেতে পারে কিন্তু যা গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না।"

"তা হয়ত ফিরবে না, কিন্তু জমিদারিটা ফিরবে।"

এমন সময় একজন পাইক আসিয়া খবর দিল, দেবাইপুরের কাছারিতে আগুন লাগিয়াছে।

বিহারীলাল মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বলিলেন, এ যে একদিন হবে, এ তো জানি মল্লিক। সম্ভবতঃ রামচন্দ্রকে আর পাওয়া যাবে না। বড় দেরী হোয়ে গেল মল্লিক,—দুদিন আগে হোলে বোধ হয় কিছু করা যেতো।

মল্লিক কহিল, "কিন্তু আমিও কিছু সহজে ছাড়বো না।"

বিহারীলাল সহাস্যে বলিলেন, "সে তুমি যা হয় ক'রো, কিন্তু আমাদের দৌড়ও তার অজানা নেই। সে বেশ জানে, দুই বুড়োর হাত তার আর নাগাল পাবে না।

মল্লিক সে-প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিল, "সোনারপুরের কিছু খবর আছে।"

"কেন, সেখানে আবার কি হোলো?"

"হয়নি কিছু, পঙ্কজ কোলকাতায় বড় একটা চাকরি পেয়েছে—হাঁ, ছেলে বটে একটা, তবে এমন ছেলে থেকেও কোনো কাজে এলো না।"

"অমন কথা মনেও উচ্চারণ কোরো না মল্লিক,—তাকে মানুষ কোরে দিয়েছি, সে নিজের জীবনে কষ্ট না পায়। নইলে তার স্বোপার্জ্জিত অর্থ এ-বংশের তহবিলে কোনোদিনই উঠবে না। সে বড় হোক, দশজনের একজন হোয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করুক,—আমার তাতে গৌরবও নাই, কোনো স্বার্থও নাই।"

মল্লিক সহাস্যে কহিল, তা তো নিশ্চয়, তবে কিনা ওর নামে ব্যাঙ্কে 'য়্যাকাউণ্ট' আছে আর সেটা যখন হুজুরেরই দেওয়া, তারও তো এখন

কোনো কাজে লাগছে না—ঈশ্বরেচ্ছায় সে মোটা রকমেরই রোজগার করছে—

"না মল্লিক, বিহারী বাঁড়ুয্যে যে-থুথু একবার ফেলে তা আর চাটে না।"

"তা তো বটেই, তবে কিনা এই দুঃসময়ে টাকাটা পেলে—পরে আবার তার নামেই ব্যাঙ্কে জমা হোতো।"

"না, না, মল্লিক, অভাব বোধ কর, মহাল বিক্রী করো,—আমি একটি কথাও বলবো না। লোক লাগাও, আমি দেবাইপুরের মহাল বিক্রী করবো। বলিতে বলিতে বিহারীলাল অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর আরও দুইমাস গত হইয়াছে। বিহারীলালের দেহ ও মন দুইই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, শেষপর্য্যন্ত সামলাইতে না পারিয়া শয্যা লইয়াছেন। মনোভঙ্গের এই নিদারুণ ক্লেশ তাঁহাকে একদিকে যেমন পীড়িত করিতেছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, মল্লিককে ডাকিয়া বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র একটা বিলিব্যবস্থা কোরে ফেলো, —এর পর আর সময় পাবে না।"

মল্লিক সহাস্যে কহিলেন, "খুব সময় পাবেন, কবিরাজ মহাশয় মিথ্যা বলেন না।"

"একটা কথা কি জান মল্লিক, এই দেহটাকে আর বড় বেশী বিশ্বাস করতে পারি না। এখন কেবলই মনে হচ্ছে, ফাঁকি দিয়ে এতটা কাল বেঁচে এসেছি—আর বাঁচতে গেলে নিজেই ঠকবো।"

মল্লিক কোনো কথা বলিলেন না। আর বলিবারই বা ছিল কি? সারাটা জীবন কত দুষ্কর্ম্মের মধ্য দিয়া ঐ বিহারীলালের সহিত তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে তাহার ইতিহাস অন্যে না জানিলেও, তিনি তো জানেন, আর জানেন বলিয়াই আজ জীবন-সায়াহ্নে নিজেকেও ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে

লাগিল এমনি করিয়া তাঁহাকেও একদিন সব দেনা শোধ করিয়া যাইতে হইবে।

বিহারীলাল বলিলেন, "আমার কি মনে হচ্ছে জান মল্লিক, এর আর আদি অন্ত নাই,—চোখ বুজে প'ড়ে প'ড়ে আমি সেই সব কথাই ভাবছি। একদিন ছিলো, যখন এগুলোকে তুচ্ছই মনে হয়েছে,—আজ দেখছি, কিছুই ফেলা যায় না—সব পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় নিয়ে যেতেই হবে।"

"আপনি কেন ভাবছেন, আবার ভাল হোয়ে উঠবেন।"

"ভাবিনি মল্লিক, আর ভাববারই বা আছে কি,—যখন এর কূল কিনারাও নেই। তবে কি মনে হয় জান, শুধু আমার পাপেই সব জ্ব'লে পুড়ে গেলো।

এমন সময় কাছারি প্রাঙ্গনে গোলমাল উঠিল, ভৃত্য রামহরি আসিয়া খবর দিল, দেবাইপুরের গোমস্তাবাবুকে কয়েকজন পাইক ধরিয়া আনিয়াছে। বিহারীলাল উত্তেজিত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, তাকে একবার এখানে আনতে পারো মল্লিক? আমি শুধু একবার তাকে দেখবো।"

মল্লিক দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্রকে সকলে মিলিয়া উহারা বাঁধিয়া আনিয়াছে। ঐ বদ্ধাবস্থাতেই তাহারা তাহাকে কর্ত্তার নিকটে লইয়া আসিল। কর্ত্তা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সহাস্যে বলিলেন, "তারপর রামচন্দ্র, বাড়ীঘর, স্ত্রীপুত্রের সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছো তো? না এসে থাকো, আমি তার জন্যে তোমাকে আরও কিছুদিন সময় দিচ্ছি।"

রামচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "আমাকে এবারের মত ক্ষমা করুন।"

বিহারীলাল গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ক্ষমা না করলে তোমাকে

এতক্ষণ গুলি কোরে মারতাম। এর বেশী দয়া তুমি আমার কাছে কি কোরে আশা কর?"

"অভাবের তাড়নায় লোভ আমি সামলাতে পারিনি, কিন্তু আপনার ক্ষতি করবো এমন অমানুষ আমি সত্যিই নই।" বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের গলা ধরিয়া আসিল।

বিহারীলাল বিচলিত হইয়া উঠিলেন, একবার কি যেন বলিতেও গেলেন,—ঠোঁট নড়িল কিন্তু কথা বাহির হইল না।

নায়েব ইহা লক্ষ্য করিয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ক্ষতির পরিমাণ সামান্য নয় যে, দুফোঁটা চোখের জল দেখে মানুষ ভুলে যাবে।"

"থাক থাক মল্লিক, ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েছে,—সে আর ফিরবে না।" পরে পাইকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ওরে, তোরা বাঁধন খুলে দে—হারামজাদা ব্যাটারা, এমনি কোরে মানুষকে বাঁধে কখনো।"

রামচন্দ্র ছাড়া পাইয়া আভূমি প্রণাম করিয়া কহিল, "আপনার জয় জয়কার হোক,—আপনি দেখবেন, রাচমন্দ্র বেইমান নয়।"

মল্লিক সহাস্যে কহিলেন, "বেইমানের মানে জানো রামচন্দ্র!"

বিহারীলাল অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "থাক্ থাক্ মল্লিক, ও যখন অনুতপ্ত—"

বাধা দিয়া রামচন্দ্র কহিল, "অনুতপ্ত সত্যই কিন্তু সে বেইমানী করার জন্য নয়, কারণ আমি নিজে জানি,—আর যাই কোরে থাকি, বেইমানী আমি করিনি। অভাবের তাড়নায় মানুষ নিজের সন্তানকে পর্য্যন্ত বিক্রী করে,—সে কি তার স্নেহের অভাব ব'লে করে? ক্ষতি আমি করেছি,—হুজুর বিশ্বাস রাখলে, সে-ক্ষতিরও হয়ত একদিন পূরণ হোতে পারবে কিন্তু বিনা চিকিৎসায় ছেলেগুলো ম'রে গেলে—"

"না, না, চিকিৎসা হবে না কেন,—" বলিতে বলিতে বিহারীলাল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "মল্লিক, তুমি বরং আরও কিছু টাকা রামচন্দ্রকে দাও। ছেলের চিকিৎসা হবে না, সে কি কথা!

রামচন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "না, টাকার আর আমার দরকার নাই। তাছাড়া ছেলেরা আমার এখন ভালই আছে।"

"যাক্, ভাল থাকলেই ভাল। তোমার সংসারের এ রকম অবস্থা, আমাকে তো কোনোদিন জানাওনি রামচন্দ্র! জানালে ভাল করতে—তা যাক্, যা হবার হোয়ে গিয়েছে।"

একজন আসিয়া খবর দিল, কবিরাজমশায় আসিয়াছেন। মল্লিক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি অন্যায় করলেন বলুন দেখি! উত্তেজিত হোয়ে অনেক বাজে কথা ব'লে কবিরাজ মশায়ের উপদেশ লঙ্ঘন করলেন। তিনি শুনলে দুঃখিতই হবেন।"

রামচন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল, "তবে তো খুব অন্যায় করলাম,—অসুস্থ শরীরকে আমিই অনর্থক ব্যস্ত কোরে তুলেছি। না, না, খুবই অন্যায় করেছি।" বলিতে বলিতে নিতান্ত অপরাধীর মত রামচন্দ্র মাথা নীচু করিয়া প্রস্থান করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রঞ্জন বলিয়াছিল বিলাত যাইবে এবং তাহারই পাথেয় সংগ্রহ করিতে একদিন সে মায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু মাতার সাহায্যলাভ করিযা সেই যে সে একদিন বাটির বাহির হইয়াছিল, তাহার পর এই দীর্ঘ তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল, রঞ্জনের কোনো সংবাদই কেহ জানে না। সে বিলেত গেল, কি কলিকাতাতেই রহিয়া গেল এ খবরও এতকাল জানা যায়নি। অবশ্য সে কাহাকেও কিছু না বলিলেও, সে যে আত্মগোপন করিয়া এই কলিকাতাতেই বাস করিতেছে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। যে কারণেই হউক, বিলেত তাহার যাওয়া হয় নাই। মিস মিলি মিটারও শেষপর্য্যন্ত তাহার দাদাকে ফাঁকি দিয়া রঞ্জনের সহিত এক-ফ্ল্যাটে বাস করিতেছে। উভয়ের টাকা মিলিত হইয়া যে-মূলধন ব্যাংকে জমা হইয়াছে তাহাতে এই তিন বৎসর বেশ ভালভাবেই কাটিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভালভাবে কাটিবার মত টাকা রঞ্জনের ব্যাংকে জমা আছে। বিহারীলালের যখন সময় ভাল ছিলো তখন একটি মোটা অংক দুই পুত্রকে সমানভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। রঞ্জন সে-টাকায় আজপর্য্যন্ত হাত দেয় নাই এবং হাত দিবার সংকল্পও তাহার নাই। তাই আজ দীর্ঘ তিন বৎসর পরে নিজের কুশলবার্তা জানাইয়া সে তাহার মাকে টাকা চাহিয়া পত্র দিয়াছে। মিলি ইহার কিছুই জানে না,—জানিবার প্রয়োজনও তাহার নাই। আরাম করিয়া থাকিবার সকলরকম উপকরণকে হাতের কাছে পাইয়া সে খুসীই আছে। কে কাহার জন্য কতটুকু করিতেছে এবং শেষপর্যন্ত করিবে কিনা ইহা জানিবার কৌতূহলও তাহার নাই। ভালবাসিয়া দুঃখকে বরণ করার মধ্যে মহত্ব যদিই বা থাকে, গর্ব্ব কিছুই

নাই। তাছাড়া উহাকে ভালবাসার নিদর্শনরূপে স্বীকার করিতে মিলি মিটার কোনদিনই রাজি নয়। রঞ্জনকে দেখিয়া অবধি তাহার ঐশ্বর্যের রূপটাই মাথার মধ্যে নিরন্তর পাক খাইয়া ঘুরিয়াছে, যাহার জন্য আজ সকল কিছু তুচ্ছ করিয়া এই একমাত্র আশ্রয়কেই শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া জানিয়াছে। রঞ্জন ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না। সে জানে, মিলির মত ভালবাসিতে আর কেহ দ্বিতীয় নাই, তাই সর্বস্ব খোয়াইয়াও ঐ মিলির হাতেই নিজেকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। যাই যাই করিয়াও বেলা আর যাইতে চাহে না, —এক গ্লাস সরবৎ হাতে করিয়া মিলি ঘরে ঢুকিল, বলিল, "তুমি কি আজ আর বিছানা থেকে উঠবে না ?

"উঠেই বা কি করবো, যতটুকু শুয়ে থাকি ততটুকুই লাভ। তাছাড়া কাজকর্ম না থাক্‌লে নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়,—পুরুষমানুষ না হোলে ব'সে ব'সে কাঁদতাম।"

"বেশ তো চলো না, সিনেমায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসি।"

"সে আরও ভয়ানক।—আচ্ছা, বলতে পারো, প্রেম এত স্বল্পায়ু কেন ? দুদিনেই যেন নিঃশেষ হোয়ে গেল! দুঃখ কোরো না মিলি, তোমাকে অপমান করবার জন্যে বলিনি। তোমাকে আর আমার ভাল লাগছে না একথাও বলতে যতখানি ব্যথা পাচ্ছি, ভাল লাগছে বলতেও ঠিক ততখানি আমার লাগছে। কেন এমন হয় বলতে পারো মিলি ? অথচ তিন বছর আগে তোমাকে পাবার জন্য কি চেষ্টাই না করেছি, আজ সেসব কথা মনে হোলে হাসি পায়। কি আশ্চর্য্য মিলি, একদিন ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইনি, আজ ঘুমুতে পেলেই যেন বেঁচে যাই।"

মিলি এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহে নাই, নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, এইবার সে চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখ অতিশয় পাণ্ডুর এবং কথা কহিতে গিয়া ওষ্ঠাধরও কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার

পরেই সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "এমনি কোরে তুমি আমাকে বার বার অপমান করো কেন বলো তো? ভাল না লাগে, গেলেই তো পার, আমি তো তোমাকে ধ'রে রাখিনি।"

"ধ'রে বোধ হয় কেউ কাউকেই রাখে না মিলি, কিন্তু তবু ছাড়াও তো কেউ পেলে না দেখলাম। তুমি ভাবছো, আমি চ'লে যাবার জন্যই এত কথা বলছি, বিশ্বাস করো মিলি, চ'লে আমি যাব না, আর চ'লেই বা যাব কোথায়—কোথাও শান্তি নাই মিলি, কোথাও—

বলিতে গিয়াও আর তাহার বলা হইল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সব মিথ্যা, মিথ্যা। অথচ এই মিথ্যাকে লইয়াই তাহার জীবন কাটিবে!

মিলিও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইতেছিল, বলিল, "কই আর বুঝি কথা জোগালো না? ভার হোয়ে থাকি, বিদায় করো।"

বাধা দিয়া রঞ্জন চিৎকার করিয়া উঠিল, "মিলি!" তারপর সুর নামাইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, "আমাকে ভুল বুঝো না মিলি, ভাল যদি না লাগে নালিশ করবো না, তাই ব'লে একদিনের ভাল লাগার কি কোনো মূল্যই দেবো না?"

"তা হয়ত দেবো, কিন্তু দামই যে দিতে হবে আর সে-দাম যে নিতেই হবে এমনো কোনো কথা নাই।"

"কথা যাই থাক্ মিলি,—হিন্দু স্ত্রী কিন্তু এই দামের মূল্যই সারাটা জীবন ধ'রে দিয়ে আসছে। কোনোদিক দিয়ে কোনো কারণেই পরস্পরকে তারা ত্যাগ করবার কল্পনাও করে না। তারা জানে, এ-বন্ধন তাদের ধর্মের বন্ধন,—আজ তোমার মধ্যে সেই-বন্ধন কোথাও নেই ব'লেই না তোমাকে বিদ্রোহী কোরে তুলেছে? কিন্তু হিন্দুই বলো, ব্রাহ্মই বলো, আর খৃষ্টানই বলো, মূলতঃ সেই বন্ধনকেই স্বীকার কোরে

নিয়ে এর কাঠামো বানানো হয়েছে। তবে তোমাদের বাঁধন আইনের বাঁধন আর আমাদের ধর্মের। আইনের জোরে এই বাঁধন একদিকে যেমন শক্ত হয়েছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি হয়েছে শিথিল। আজ যে-আশংকা তোমার মনে জেগেছে, তার মূলেও রয়েছে ঐ আইনের ছিদ্র, নইলে একথা তোমাদের কেন মনে হয় না, বিবাহে প্রীতির বাঁধনই বড় বাঁধন ? সেখানে কোনো ধর্ম বা আইনের জোর খাটে না ?”

দেখিতে দেখিতে মিলির সমস্ত মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। রঞ্জনের কথা শেষ হইতেই কঠিন মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এক স্বামী নিয়ে ঘর-করার দৃষ্টান্ত এক তোমাদের হিন্দুঘরেই আছে এই বা তোমার মনে আসে কি কোরে ? ছাপার বইয়ে তুমি যে-কথাই প’ড়ে থাকো, এবং আমি খৃষ্টান বোলে যত অপমানই আমাকে করো, কিন্তু এও জেনো, তোমাদের ঘরের বধূর চাইতে আমি কোনো অংশেই ছোটো নই। বলিয়া স্তম্ভিত অভিভূত রঞ্জনের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়াই এই গর্বিতা রমণী দৃঢ়-পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিলি চলিয়া গেলে রঞ্জন একইভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। অনেকদিনের অনেককথাই আজ একে একে মনে পড়িয়া গেল। যে-উদ্দাম ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ জীর্ণ আশ্রয়ের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র তিরস্কার, সহস্র কটূক্তি করিয়া লাঞ্ছিত করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আজ সে কোনোক্রমেই মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। কিন্তু কেন এমন হয় ? মিলির ব্যবহারেও তো এমন কিছুই প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে তাহাকে এতখানি আঘাত না করিলেই চলিতেছিল না ? কারণ যাহাই থাক, এ-আঘাত না করিলেই হয়ত ভাল হইত। কারণ ব্যবহারিক জীবনে সকলদিক মানাইয়া চলাই শান্তিরক্ষার শ্রেষ্ঠ নীতি। আর কিছু না

হউক, সংসার রক্ষা করিতে হইলে উহা অপরিহার্য। নিরন্তর জল ঘোলাইতে থাকিলে পাঁকই বাহির হইয়া পড়ে।

রঞ্জনের মনের অবস্থা যখন এইরূপ তখন সকলকে বিস্মিত করিয়া বাহির হইতে সুবোধের চিৎকার আসিয়া পৌছিল, কই, রঞ্জন কোথা হে?

"একি! সুবোধ যে! এস, এস, বাড়ির ভেতরে এস।"

সুবোধ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া বলিল, যাক্, খুঁজে বের করেছি তাহোলে? অনেকসময় মনে হয়েছে, তোমাদের সন্ধান করতে হোলে মাদাগাস্কার, কামস্কাট্‌কাতেই বা যেতে হয়!

"কেন, ভারতে আমাদের ঠাঁই না হবার মত এমন কি-অপকর্ম করেছি যে—"

বাধা দিয়া সুবোধ বলিল, অপকর্ম নয় রঞ্জন, আমি ঠাট্টা করেই বলেছি, —তুমি যে কথাটা এমন বাঁকা কোরে ধরবে ভাবতে পারিনি। যাক্, মিলি কোথায়? অনাহুত এসেছি ব'লে কি একটু চাও পাবো না?

'নিশ্চয় পাবে।' বলিয়া রঞ্জন উঠিতে গিয়াই দেখিল, মিলি দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

সুবোধ্ সেইদিকে চাহিয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, এই যে মিলি! উঃ, আজ তিনবছর পরে দেখা,—কিন্তু তোর তো কোনো পরিবর্তনই দেখছি না!

'কি রকম দেখবে মনে কোরে এসেছিলে?' বলিতে বলিতে মিলি হাসিয়া ফেলিল।

'খুব যে একটা অদ্ভুত-রকম কিছু দেখবো এমন কথা নয়, তবু যেন মনে হয়েছিল—"

"থাক্, তোমার মনের কথা দাদা। ব'সো, চা নিয়ে আসছি।" বলিয়া মিলি দ্রুত চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দেই কাটিল। একটু ইতঃস্তত করিয়া রঞ্জনই অবশেষে কথা পাড়িল, তারপর হঠাৎ কি মনে ক'রে সুবোধ?

সুবোধ চম্‌কাইয়া উঠিল। কিন্তু নিজেকে সামলাইতে তাহার বেশী দেরি হইল না, বলিল, কেন, এমনি কি আসতে নেই না কি? ঠিকানা জানা থাকলে অনেক আগেই এসে পড়তাম,—তোমরা যাই কোরে থাকো, সে তো আমার মা'র পেটের বোন। সে অন্যায় করেছে, কি ন্যায় করেছে, আজ সেকথা তোলার কোনো অর্থ আছে ব'লে আমি মনে করতেই পারিনে রঞ্জন। ভুলও যদি হোয়ে থাকে, আমরা সবাই মিলে তাকেই শাস্তি দিতে থাকব এই বা কি কথা! হাতের তীর একবার ছোড়া হোয়ে গেলে আর তা ফিরে আসবে না,—এ যে না বোঝে, তার মনুষ্যসমাজে বাস করাই ভুল। তবে একটা কথা আমি বলবো—সে আমার কথা, সে-সময় আর কিছু না হোক, আমার মতামতটা তোমাদের নেওয়া উচিত ছিলো। আমি যে বাধা দিতে পারি না,—আর কেউ না জানুক, মিলি তো জানতো। ইহার পরেই সুবোধ আসল কথা পাড়িল, বলিল, এতদিন কিছু জানাইনি,—অবশ্য জানাবার সুবিধাও হয়নি, সমাজে এই নিয়ে কথা উঠেছে—তা যাক্, কিছু টাকা দিলেই সেমুখ বন্ধ করা এমন কঠিন হবে না, কিন্তু—

"তোমার ঐ কিন্তুর কথা থাক্ সুবোধ, আমি জিজ্ঞাসা করি,—কথা কি কোরে ওঠে এবং কেনই বা ওঠে?"

"তারা বলে, খৃষ্টান না হোলে, কোনো হিন্দুর সঙ্গে একজন খৃষ্টান-মহিলার বিবাহ হোতে পারে না।"

"সুতরাং?"

"কেন ভাবছো রঞ্জন, সে ব্যবস্থা আমি করবো।"

"না, তোমাকে কোনো ব্যবস্থাই করতে হবে না। তাছাড়া ঠিক এই

কারণে আমি তোমাকে এক পয়সাও দেবো না,—তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করতে পারো।"

মিলি আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিতেছিল। সেও আগাইয়া আসিয়া ঠিক অনুরূপ কথা বলিল, আমার সুবিধা অসুবিধা তোমরা কিছুই দেখবে না, অথচ তোমাদের সকল উপদ্রবই আমাকে সইতে হবে,—কেমন, এই না দাদা? আমার বিলেত যাবার বেলায় তোমরা দিলে বাধা,—রঞ্জনবাবুর সঙ্গে মিশবার সুযোগ তুমিই একদিন দিয়েছিলে এবং মুখে না বললেও, ওকে হাতে রাখবার চেষ্টা তোমার মনের মধ্যেও যে ছিলো,—সে আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি। তবে শেষপর্যন্ত তোমাকেও ফাঁকি দিয়ে চ'লে এসেছি, এই না তোমার রাগের কারণ? কিন্তু এও জেনো, আমি আর যাই করি, তোমার প্ররোচনায় আর ভুলছি না।

নিমেষের মধ্যে সুবোধের মুখখানা কালো হইয়া উঠিল, অথচ প্রতিবাদ করিবার মত মনের জোরও তাহার আর রহিল না। এখানে আসিবার পূর্বে তাহার একবারও মনে হয় নাই, মিলি এইভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে,—সে যে এত সহজে পতিপরায়না হইয়া তাহাকেই দুকথা শুনাইয়া দিবে, এ কে ভাবিয়াছিল? অন্যপক্ষে, দাদার প্রতি ভগ্নীর মনোভাব পূর্বে যেমনই থাক, যেদিন শুদ্ধমাত্র টাকার লোভেই এই রঞ্জনকে ধরিয়া রাখিবার সকলরকম কৌশল তাহাকে দিয়াই করিয়া লইয়াছে,—নারীধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া বেহায়াপনার চরম দুষ্কৃতি সর্বাংগে বহিতে যে একদিন তাহাকেই সাহায্য করিয়াছে, সে সহোদর হইলেও মানুষ হিসাবে মিলির কাছে অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে,—তাই সেদিনও যেমন তাহাকে সে ক্ষমা করিতে পারে নাই, আজও তাহাকে ঘৃণাই করিল।

সম্মুখে চায়ের বাটিটা পড়িয়া রহিয়াছে,—বোধহয় এতক্ষণ ঠাণ্ডাই হইয়া গিয়া থাকিবে, রঞ্জন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, চা খাও সুবোধ, ওটা তো কোনো অপরাধ করেনি।

সুবোধ অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া ফেলিল এবং নিঃশব্দে চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া দিয়া বলিল, কিছু মনে ক'রো না রঞ্জন,—অবশ্য একথা সত্যি, মিলি যা বল্‌লে তা সবটা মিথ্যা না হোতেও পারে, কিন্তু আমি যা করেছি তা ওর ভালোর জন্যেই করেছি এবং আজও কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে যে আসিনি, এটা তোমরা বিশ্বাস ক'রো,—আচ্ছা, আমি চললাম, কিছু মনে কোরো না। বলিয়া, সুবোধ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেই রঞ্জন খপ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল, বলিল, ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়, অথচ যে-কারণেই হোক, সে-অপবাদও আজ আমাকে নিতে হোলো, আর নিতে যখন হোলোই তখন এমন কোরে তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

সুতরাং সুবোধকে রহিয়াই খাইতে হইল।

আহারাদির পর রঞ্জন সুবোধকে নিভৃতে ডাকিয়া কিছু টাকা দিয়া বলিল, আমার কাছে এখন বিশেষ কিছু নেই,—তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে, আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো, কিন্তু এ টাকা আমি তোমাকেই দিলাম, তোমার সমাজকে ঘুঁষ নয়।

সুবোধ আর কোনো কথা না বলিয়া টাকা কয়টি পকেটে ফেলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেলো।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রবিবার,—কলেজের ছুটি, তাই উঠি উঠি করিয়া যখন পঙ্কজের ঘুম ভাঙিল তখন বেলা অনেক হইয়াছে। তরুণ সূর্য্যালোক খোলা জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কলিকাতার রাজপথে জন-প্রবাহের বিরাম নাই। কেহ কাজে চলিয়াছে, কেহ ঘরে ফিরিতেছে, কেহ বা প্রভাতের আলো ও হাওয়ার মধ্যে শুধু শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ একসময়ে তাহার মনে হইল, এসময়ে কেহই তো ঘরে বসিয়া নাই, তবে আমিই বা বসিয়া থাকি কেন? কিন্তু বসিয়া না থাকিয়াই বা করিব কি? কোথায় যাইব,—বা কাহার কাছে যাইব?

হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, অবন্তিকার কথা। এসময় সেখানে কাটাইয়া আসিলেও তো সে পারে। অবন্তিকাও হয়তো খুসী হইবে,—মনে করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্মতৎপরতা বাড়িয়া গেল, সে মুহূর্তমধ্যে প্রস্তুত হইয়া লইল কিন্তু নিজের চাঞ্চল্য নিজের কাছেই ধরা পড়িয়া গিয়া পঙ্কজ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বাহিরে আসিয়া যেন নেশার মত তাহার সমস্ত দেহ-মন টলিতে লাগিল। একবার মনে হইল ফিরিয়া যায়, কিন্তু ফিরিতে ফিরিতেও একসময় সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, অবন্তিকার বাড়ির দরজায় আসিয়া পড়িয়াছে। বাহিরে জ্ঞানাঙ্কুর,—সম্প্রতি তাহার বেশভূষার কিছু উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। প্রায় চিৎকার করিয়া কহিল, আরে, এসো ভায়া,—তোমার যে আর দেখাই পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে এই অমানুষিক চিৎকার করিল, সে-ব্যক্তি ততক্ষণে অবন্তিকার ঘরে উঠিয়া আসিয়াছে।

অবন্তিকা কি-একটা সেলাই-এর কাজ করিতেছিল, পঙ্কজের আকস্মিক আগমনে সেও হাতের কাজ ফেলিয়া প্রায় চিৎকার করিয়া বলিল, 'ধন্য হোলাম আজি এ-প্রাতে,'—তারপরের লাইনটা যদিও মনে নাই, কিন্তু কি মনে ক'রে বলুন তো ? আমাদের মত অকিঞ্চিৎকরকে মনে প'ড়ে গেল আর আপনি ছুটে এলেন,—এ মনে করতে অবশ্য পারি না, কিন্তু এই বা কি ক'রে সম্ভব হোলো খুলে বলবেন কি ?

পঙ্কজ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, "আমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এতটা সোরগোল প'ড়ে যাবে, এ জানলে সত্যিই আমি আসতাম না। বাড়ি ঢুকতেই জ্ঞানাঙ্কুরদা যেরূপ চিৎকার ক'রে উঠলেন, তাতে এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না,—ওপরে এসেও সেই চিৎকার—অবশ্য নারীকণ্ঠজনিত মিহি চীৎকারে যে-অভ্যর্থনা সুরু হোলো, আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, ঘরে চোর এলে কুকুরগুলোও এত চিৎকার করে না।"

ইহার পর অবন্তিকার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা কঠিন হইল,—সহাস্যে বলিল, অর্থাৎ এই অবসরে আমাদেরকে কুকুর ব'লে নিলেন,—এই তো ?"

পঙ্কজ লজ্জিত হইয়া বলিল, "ছি ছি, আপনি এমন ক'রে বলবেন "জানলে—"

"বলতেন না এই তো ?"

"ঠিক তাই। উপমাছলে যে-কথাটা ব্যবহার করেছি, সেটা নিতান্তই উপমা,—আপনি অনর্থক ঝগড়া করবার জন্যেই নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিলেন।"

"তা বই কি ? ঝগড়া করা আমার স্বভাব কিনা,—আর কদিন আমাকে ঝগড়া করতে দেখলেন ?"

"আচ্ছা মুস্কিল তো ! আমি না-হয় ক্ষমা চাচ্ছি। সত্যি বলছি,

এমন হবে জানলে আমি আসতামই না। কোথায় এতদিন পরে আসছি ব'লে অনুযোগ অভিযোগ শুনবো, আর তা নয়—"

"ও ! আপনার আশা তো কম নয় ! কিন্তু ঝগড়া করা না হয় আমাদেরই স্বভাব, কিন্তু সকাল থেকে এসে পর্য্যন্ত তো দেখছি আপনিও বড় কম যাচ্ছেন না। একটা চাকরি দেবার কথা বললাম, তা তো কানেই তোলা হোলো না—কেন, আপনার চাইতে আমি কমটা কোথায় শুনি ? আপনিও এম-এ পাস করেছেন, আমিও এম-এ পাস করেছি—"

"আঃ, আমি কি বলেছি, আমার চাইতে আপনি ছোটো ?"

অবন্তিকা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তবে কিসের বড় ? দেখবেন, বয়সে বড় ব'লে ফেলবেন না যেন !"

পঙ্কজও হাসিয়া উত্তর দিল, "হাঁ, তাই হওয়াই উচিত ছিল।"

"কক্ষণো তা উচিত ছিলো না।"

"কি মুস্কিল ! সকালবেলায় এলাম, একটু চাও কি পাবো না ?"

কলরব শুনিয়া মহামায়া ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, কি হয়েছে রে অবন্তি ?" তারপর পঙ্কজকে দেখিয়া আদ্যোপান্ত সমস্তই বুঝিলেন। হাসিয়া বলিলেন, কখন এলে পঙ্কজ ?

"এসেছি অনেকক্ষণ পিসীমা,—চা না খেয়েই বেরিয়েছি, ভাবলাম, সেই যখন ওখানে গিয়ে খেতেই হবে তখন বাড়ির চা আর নষ্ট করি কেন, —কিন্তু এখন দেখছি, কাজটা ভাল করিনি।"

অবন্তিকা অতিকষ্টে হাসির বেগকে সংবরণ করিয়া ছুটিয়া পালাইল।

মহামায়া সহাস্যে বলিলেন, "ও চা পাওনি বুঝি ? কিন্তু এতদিন এসোনি কেনো বলো তো ?"

"সময় পাই না পিসীমা !"

"তোমার মা কি এসেছেন ?"

"না, সে-সুবিধাও হয়ে ওঠেনি।"

"তবে তো বড় কষ্ট হচ্ছে!"

"কিছু না। আপনি জানেন না পিসীমা, উড়ে-বামুনগুলো খুব ভাল রাঁধে। ওরা যদি কোলকাতা সহরে না থাকতো, তবে কোলকাতায় আইবুড়ো ছেলেও পেতেন না।"

মহামায়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন, "ঠিক বুঝলাম না।"

এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলেন না পিসীমা, আমাদের আইবুড়ো-কালটা হোস্টেলেই কাটে কিন্তু সে-সময় উড়ে-বামুনের অভাব হোতো যদি, তবে আমাদের সবাইকেই এক-একটি বৌ নিয়ে কোলকাতায় বাস করতে হোতো,—নইলে ভাত রাঁধতো কে?"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "তা বটে।"

অবন্তিকা চা লইয়া ঘরে ঢুকিতেই পঙ্কজ অন্যপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, "আপনার কাছে একটি নিবেদন আছে।"

"কি বলুন?"

"আপনি চেষ্টা ক'রে গাম্ভীর্য্য আনবার কসরৎ করবেন না,—ওটা সবাইকে মানায় না।"

"তবে কি কেবল ঝগড়া করাই আমাকে মানায়,—এই কি বলতে চান আপনি?"

"দেখুন, কথাটা অপ্রিয় হোলেও, প্রকৃতি সকলের সমান নয়। আপনি যা,—আপনাকে দিয়ে কেবলমাত্র তাই করানো যেতে পারে, তার বিপরীত কিছু করতে গেলেই ধরা প'ড়ে যাবেন।"

"বেশ, এবার থেকে ঝগড়াই করবো তাহ'লে।"

"রক্ষা করুন, ঝগড়া সকাল থেকে আজ অনেক হয়েছে,—এবার দুটো-একটা মিষ্টিকথা বলুন, শুনে বাড়ি যাই।"

"প্রকৃতিবিরুদ্ধ হবে না তো?" বলিতে বলিতে অবন্তিকা হাসিয়া ফেলিল।

মহামায়া হাসি চাপিয়া দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "আজ তো ছুটির দিন, উড়ে-বামুনের হাতে না খেয়ে এখানেই দুটি খেয়ে যাবে পঙ্কজ।" বলিয়াই মহামায়া যেমন আসিয়াছিলেন তেমনি চলিয়া গেলেন। পঙ্কজের দিক হইতে যে কোন জবাবের প্রয়োজন থাকিতে পারে,—সে খাইবে কি, খাইবে না —ইহার কোনো অবকাশই দিলেন না।

পঙ্কজ চা-এর বাটি নামাইয়া দিয়া কহিল, "বাঃ, বেশ তো!"

"কেমন জব্দ!"

পঙ্কজের কোনো কথাই কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে যেন দম-দেওয়া কলের মত বলিয়াই চলিয়াছে, "না, না, খুব অন্যায়—তা ছাড়া কত রকমের অসুবিধে,—স্নানও তো করতে হবে আমাকে!"

"ওসব কথা আমাকে বলছেন কেন? যিনি আপনাকে খেতে বলেছেন, আপনার অসুবিধার কথা তাঁকে বললেই ভাল হয় না?"

"তিনি আমাকে বলতে দিলেন কই!"

"বলুন, না হয় পিসীমাকে ডেকে দিই।"

"না, না, আর ডাকতে হবে না আপনাকে।—ভাল করতে পারবেন না, মন্দ করবেন।"

"আপনার আর খেয়েও কাজ নেই, আমারও মন্দ ক'রে দরকার নেই। পিসীমাকে ব'লে দিচ্ছি, আপনি আমাদের বাড়িতে খেতে পারবেন না।" অবন্তিকা প্রস্থানের উপক্রম করিতেই, পঙ্কজ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "আপনি আচ্ছা ছেলেমানুষ তো!"

"আপনিও তো বেশ মানুষ দেখছি,—অমন ক'রে কেউ ধরে নাকি? লোকে দেখলে কি মনে করতো বলুন তো?"

পঙ্কজ অপ্রস্তুত হইয়া ছাড়িয়া দিল। বলিল, "সত্যিই খুব অন্যায় হোয়ে গেছে,—আপনি অমন কোরে না চ'লে গেলে তো আমাকে ধরতে হোতো না।"

"চ'লে গেলেই ধরতে ছুটবেন,—এও তো ভাল কথা নয়।"

এইবারে পঙ্কজ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আমার বুদ্ধিশুদ্ধি খুব কম,—নয় ?"

অবন্তিকা হাসিতে হাসিতে বলিল, "খুব কম।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কয়েকটা অত্যন্ত জরুরি কাজে বৃদ্ধনায়েব মল্লিকমহাশয়কে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে। যথাসম্ভব কাজগুলি প্রায় শেষ করিয়া তিনি একবার পঙ্কজের বাসার সন্ধানে বাহির হইলেন। সন্ধ্যার পর পঙ্কজ বাসায় আসিয়া শুনিল, কে-একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহার সন্ধানে আসিয়াছেন এবং তাহারই ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। পঙ্কজ নমস্কার করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

মল্লিক সহাস্যে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমাকে তো তুমি চেনো না বাবা—আর চিনবেই বা কি ক'রে, কখন তো দেখোনি,—তোমার পিতা বিহারীলাল আমার মনিব, সরকারি কাজে কোলকাতায় এসেছি, আবার কালই ফিরে যাবো। এতদিন তোমার কোনো খোঁজ না নিলেও, আমরা সকল খবরই রাখি বাবা। আজ স্বার্থের খাতিরে এসেছি ব'লে অভিমান হয়ত করতে পারো, কিন্তু এটুকু জেনো, তোমার পিতার আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা থেকে তুমি কোনোদিনই বঞ্চিত নও।

লেখাপড়া শিখেছো, সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছো,—সব কথা না বললেও বুঝতে পারবে কর্তামশায় কেন তোমাদের দূরে দূরে রাখতে বাধ্য হোয়েছেন।—অবশ্য তোমার মা এই বুড়ো-নায়েবকে ভাল কোরেই জানেন।"

পঙ্কজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, কথা পরে হবে,—আপনি চা খান তো ?"

"চা ?—খাই না বটে, তবে কিছু না খেলেও তুমি হয়ত রাগ করবে, তাছাড়া, আজ দুদিন খুব পরিশ্রমও হয়েছে—তোমরা নাকি বলো, চা খেলে ক্লান্তি দূর হয়, তা আনাও—তোমরা কি আর মিথ্যা বলবে।"

পঙ্কজ হাসিয়া ভৃত্য বলরামকে চা-এর কথা বলিয়া দিল। তারপর বলিল, "কাল না হয় নাই গেলেন, দুদিন বিশ্রাম ক'রে যাবেন।"

"না বাবা, সরকারি কাজ—মিছিমিছি দেরি করা নিয়মবিরুদ্ধ, তাছাড়া লোকজন তো আর কেউ নেই—সব আমাকেই দেখাশোনা করতে হয়। আহা, কি জমজমাটই না ছিলো একদিন,—তুমি তো দেখোনি, দুপুরবেলাটা সদরকাছারিতে যেন মেলা বসতো।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, জামার হাতায় চোখ মুছিয়া আবার বলিলেন, "কিছু নাই বাবাজি, আর কিছু নাই।"

বৃদ্ধের কথায় পঙ্কজ বিস্মিত হইয়া কহিল, "এত বড় সম্পত্তি,—গেলোই বা কিসে ?"

"সব কর্মফল বাবা, সব কর্মফল। কিছুই ফেলা যায় না,—একদিন যিনি দেবার দিয়েছিলেন, আবার তিনিই হাত মুচড়ে কেড়ে নিলেন। আর তাও বলি বাবা, কর্তার আর যে-দোষই থাক, অমন লোক আর হয় না।"

ভৃত্য চা আনিয়া দিলে পঙ্কজ কহিল, "নিন, চা খান। কিন্তু আমি বলি কি কাকা, আজ রাত্রে এখানেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে কাল

সকালেই না হয় যাবেন,—আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, আমার ঠাকুর আছে।”

মল্লিকমহাশয় হো হো করিয়া যদিও প্রথমটা হাসিলেন, কিন্তু পঙ্কজের ব্যবহারে তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিষ্ঠুরের মত ‘খাইতে পারিব না’ বলিতেও আর পারিলেন না বরং বলিলেন, “তুমি ঠাকুরের কথা কি বলছো বাবা, তোমার ছোঁয়া খেলে আমার জাত যাবে না,—আর এও জানি, মানুষের কখনো জাত যায় না। বেশ, ঠাকুরকে ব’লে দাও, আমি এখানেই থাবো। তবে কাল আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে বাবা,—নইলে সত্যি কথা বলতে কি বাবা, বুড়োকে একরকম লুকিয়েই এসেছি।”

“লুকিয়ে এসেছেন! তবে যে বললেন, সরকারি কাজে এসেছি?”

“কাজ অবশ্য কিছু ছিলো বই কি, কিন্তু তার জন্য যে এত শীঘ্র কোলকাতা আসবো,—একি আর বুড়ো জানে! কিন্তু আমার আসল কাজ তোমার কাছে।”

“কি বলুন?”

“বলবো বই কি বাবা! বলবার জন্যই তো আসা। চিরটা কাল যার নুন খেলাম, আজ শেষ বয়সে তাকে পথে দাঁড়াতে দেখে যাবো?”—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের গলা ধরিয়া আসিল, তারপর বলিলেন, “আমি রঞ্জনের কাছেও গিয়েছিলাম।”

“রঞ্জন কে?”

“হাঁ, তুমিই বা কি ক’রে জানবে,—রঞ্জন তাঁর বড় ছেলে,—কোলকাতাতেই থাকে, সে এক খৃষ্টানের মেয়েকে বিয়ে করেছে—বলে তো বিয়ে, কে জানে কি! দোষ আর কার দেবো বাবা,—যে-বংশের যে-ধারা। মুহূর্তের বেদনায় আহত হইয়া মল্লিকমশায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, তা গিয়েছিলাম তার কাছেও,—সে কি বললে জানো? বললে, বাপ হোয়ে যিনি ছেলের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই

রাখলেন না, তখন ছেলের কাছেই বা তিনি প্রত্যাশা করেন কি ব'লে! চ'লে এলাম বাবাজি,—এর চেয়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের না খেয়ে মরা ভাল।"

"কত টাকা হোলে জমিদারি রক্ষা হয় বলতে পারেন?"

"লাখ খানেক টাকা হোলে কতকটা তিনি সামলাতে পারবেন,—এও তোমাকে ব'লে রাখলাম বাবাজি!"

"আপনি তো এসেছেন, আমার নামে যে-টাকাটা আছে—"

"হাঁ বাবাজি,—আবার তোমার টাকা তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো, কিন্তু এই অসময়ে তুমি রক্ষা না করলে,"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ নায়েব পঙ্কজের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"আঃ, কি করছেন কাকা! টাকা তাঁরই,—আমার নেবার অধিকার আছে কিনা জানি না এবং তা জানি না ব'লেই আজো পর্য্যন্ত আমি এক পয়সাও সেটাকা থেকে খরচ করিনি,—আর শুধু তাই নয়, ইহলোকে বা পরলোকে যাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই আমার রাখা চলবে না, তাঁর টাকাটাই বা আমি নিতে যাই কেন? তিনি আমাকে মানুষ করেছেন,—এ তাঁর অসীম দয়া, না করলেও কারো পক্ষ থেকে কোন নালিশ ছিলো না,—তাঁর কর্তব্যও হয়তো নয়,তবু যে তিনি এতটা করেছেন এর ঋণ আমার কাছে ভারী হোয়ে রইলো। পঙ্কজের গলা ধরিয়া আসিল, একটু থামিয়া আবার কহিল, আপনি আর দুটো দিন অপেক্ষা ক'রে যান কাকা, কারণ টাকাটা ব্যাংক থেকে তুলতে হোলে মা'র একটা সই চাই।—দুটো দিন বই তো নয়।

মল্লিকমশায়ের চক্ষু-দুটিও আর শুষ্ক রহিল না,—প্রথমে বড় বড় কয়েকটি ফোঁটা, তারপর বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিতে লাগিলেন, তোমাকে আজ যারা স্বীকার করলে না বাবা, তারা যত বড়ই হোক, ভগবানের কাছে তারা ছোটো হোয়ে রইলো। তারপর প্রাণপণ বলে পঙ্কজকে বুকের সহিত

জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, তোর ভাল হবে বাবা, তোর ভাল হবে।

রাত্রে আহারাদির পরও কিন্তু পঙ্কজ বৃদ্ধকে নিষ্কৃতি দিল না। পিতৃপরিচয় জানিবার সৌভাগ্য ভগবান যখন তাহাকে এমনি করিয়াই দিলেন, তখন সেখানকার তুচ্ছ-ধূলিমাটিরও সংবাদ লইবার আগ্রহে পঙ্কজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিয়া চলিল। বৃদ্ধেরও ক্লান্তি নাই,—একটির পর একটি তাহার সকল প্রশ্নের জবাব দিয়া যেন তিনি ঋণমুক্ত হইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে পঙ্কজের চোখের উপর তাহার জন্মভূমির ছবিখানি ভাসিয়া উঠিল। সে যেন প্রত্যক্ষ করিল, গঙ্গার অপর পারে তার মা'র ক্ষুদ্র কুটিরখানি,—আজও তেমনি তাহাদের মুখ চাহিয়া প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়কে তুচ্ছ করিয়া নিজেকে খাড়া রাখিয়াছে, আজো আছে তাহাদের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু,—ঐ সেই তুলসীমঞ্চ, ন্যাড়া-বটতলা, কিন্তু—

পঙ্কজ আর ভাবিতে পারিল না। আজ কাহার পাপে, কোন্ নিষ্ঠুর ভগবানের অবশ্যম্ভাবী বিধান মাথায় লইয়া চিরদিনের জন্য তাহাকে তাহার ঐ জন্মভূমি হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে, একবার প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এ-প্রশ্ন আজ সে কাহাকে করিবে ?

পঙ্কজের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, তেজ দেখেছিলাম বটে তোমার মায়ের,—নিজের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সেই যে চ'লে এলো, আর গাঁয়ে কেউ তার মুখ দেখতে পায় নাই। তারপর পঙ্কজের চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, অমন মা না হোলে এমন ছেলে হয় !

মা'র কথা উঠিতেই পঙ্কজের ম্লান মুখখানি সহসা অন্তর্হিত হইল, বলিল, সত্যিই কাকা, এমন মা আর হয় না।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

আরো দুটি দিন অপেক্ষা করিয়া মল্লিকমশায় টাকা সঙ্গে লইয়াই বাড়ি ফিরিলেন। বিহারীলাল সহাস্যে কহিলেন, মল্লিকের কি কোলকাতা ছেড়ে আর আসতে ইচ্ছা করছিলো না ?

মল্লিক হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিলেন, কথা মিথ্যা নয়,—বুড়ো বয়সে একটু আরাম করতে ইচ্ছে হোলো,—তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটু ইতঃস্তত করিয়াই বলিলেন, রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম—

বিহারীলালের হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল,—একটি কথাও তিনি বলিতে পারিলেন না, কেবল দুরু দুরু বক্ষে মল্লিকের মুখের দিকে চাহিয়া হয়ত বা কোনো নূতন আঘাতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইলেন। তারপর মল্লিকের মুখে রঞ্জনের সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি প্রায় চিৎকার করিযা উঠিলেন, হারামজাদা, আমার সর্ব্বনাশ করেছে মল্লিক! তুমি এসেছো ভালই হয়েছে, এবার গিন্নীর একটা ব্যবস্থা করো,—তিনি যে ভেতরে ভেতরে আমার এমন সর্বনাশ ক'রে ব'সে আছেন কে জানতো! মল্লিককে মুখের দিকে 'হাঁ' করিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে মল্লিক! সিন্দুকে নগদ যা-কিছু ছিলো,—তা ছাড়া গহনা—

মল্লিক চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, নাই ?

'না। কি ক'রে থাকবে বলো, মা-ব্যাটায় ষড়যন্ত্র না করলে, আমাকে পথে বসানো চলে কি কোরে! বুঝলে না মল্লিক, গিন্নী আমার ছেলের আব্দার রক্ষা করেছেন।' তারপর মল্লিকের দিক হইতে কোনো সাড়া না পাইয়া কণ্ঠস্বর সংযত করিয়াই কহিলেন, যা এবার ভাল

বোঝো করো মল্লিক,—আমাকে তোমরা ছুটি দাও। একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ভগবান দয়া করলেন না, আবার খাড়া ক'রে দিলেন, বুঝতে পারছি আরো শাস্তি বাকি আছে।—টাকা ফুরিয়েছে মল্লিক, হতভাগা আবার কিছু চেয়ে পত্র দিয়েছে। বলিযা পকেট হইতে রঞ্জনের লিখিত পত্রখানি মল্লিকের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

মল্লিক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আবার তাহা ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, 'মা হওয়া যে কত শক্ত,—কিন্তু কেনো শক্ত এবং কোথাও এরূপ মা দেখিয়াছেন কিনা তাহা বলিতে গিয়াও, তাঁহার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। পরে এইভাবেই কথাটা শেষ করিলেন, পঙ্কজকে দেখলাম,—হাঁ, ছেলের মত ছেলে, তার যত্ন, আপ্যায়ন আমি কোনোদিনই ভুলবো না।

বিহারীলাল হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোমাকে তো সে বোধহয় চেনে না!

মল্লিক সে-কথা যেন শুনিতেই পাইলেন না এইভাবে বলিলেন, বিদ্যা যে মানুষকে কত বড় করে, তাকে না দেখলে বলা যাবে না। আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে, শুধু এইকথাই সে বললে, আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগলাম না, তবু যদি আমার টাকাটা কোনো উপকারে লাগে—আবার সময় হোলে দেবেন, আমি মাথা পেতে নেবো, কিন্তু আজ যদি না নিয়ে ফিরিয়ে দেন, তার চেয়ে বড় শাস্তি আর আমার নেই।

বিহারীলাল অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বারকয়েক শূন্য আকাশের দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

মল্লিক বলিয়াই চলিলেন,—"তা আমি মনে করেছি, টাকাটা আমরা কাজে লাগাই, সবকিছু বজায়ও রইলো আবার ঘরের টাকা ঘরেই ফিরে এলো।"

এবারেও বিহারীলাল কিছু বলিলেন না। জবাব দিবার জন্য

তাঁহার দুই ঠোঁট ঘন ঘন নড়িতে লাগিল, কিন্তু গলা দিয়া একটাও কথা ফুটিল না।

যে কারণেই হোক, পঙ্কজের টাকা লইয়া জমিদারি রক্ষা করার প্রস্তাব বিহারীলালের মন সায় দিতেছিল না, অথচ না লইয়াও ইহার দ্বিতীয়-পথ চোখের সম্মুখে না পাইয়া তিনি আপন অদৃষ্টকে তিরস্কার করিতেছিলেন। এবং পুত্র হিসাবে পঙ্কজ যে রঞ্জনের অপেক্ষা সহস্র-গুণে অধিক বাঞ্ছনীয় ইহাও তাঁহার মনের গোপন-কোণে বিরাজ করিতেছে,—তাই তাহার সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হওয়াটাকে তিনি গভীর ক্ষতি বলিয়া মনে করিয়া কোন্ সূত্রে তাহার এই অযাচিত দান গ্রহণ করিবেন ইহাই চিন্তা করিতেছেন।

অনেকক্ষণ এইভাবেই কাটিল। কিন্তু তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া মল্লিক মনে মনে শংকা অনুভব করিলেন। তবু জোর করিয়া একটু হাস্য করিয়া আবার সেই ধুয়া তুলিয়াই বলিতে লাগিলেন, কিন্তু একটুখানি সামলে না উঠলে—

বাধা দিয়া বিহারীলাল বলিলেন, বেশ তো, সামলাতে পারো,—আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু—না, না, আর কিন্তু নয়,—বেশ করেছো মল্লিক, বেশ করেছো; আমি কোনোদিনই পারতাম না,—হাঁ, কি বললে, এবার সামলানো যাবে? তারপর অকস্মাৎ পাগলের মত হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, আবার জমিদার,—মল্লিক, আবার জমিদার। বলিতে বলিতে পাগলের মতই ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন!

বিংশ পরিচ্ছেদ

আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন অস্পষ্ট রাত্রি। মাথার উপরে একফালি চাঁদ অস্পষ্ট হইয়া বিবর্ণমুখে চাহিয়া আছে। দূর চৌরংগীতে নগরের স্তিমিত কোলাহল, ততোধিক অস্পষ্ট মোটরের হর্ণ, দক্ষিণে পিচের রাস্তার উপরে এক-একবার ফিটনের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ,—আর তাহারই অনতিদূরে এক বারান্দায় মিলি ও রঞ্জন মুখোমুখি বসিয়া তাহাদের বৈচিত্র্যহীন জীবনের হিসাব-নিকাশ করিতেছে।

মিলি আজপর্যন্ত এইটুকু বুঝিয়াছে, রঞ্জনকে লইয়া আর যাহাই করা চলুক, ঘর-করা চলিবে না।

রঞ্জনও ইদানীং বলিতে স্বরু করিয়াছে, ঘর রাখিবার জন্যই বা তোমার এতখানি মমতা কেন।

অবশ্য একথা আজ অস্বীকার করা চলে না, এই মিলিই একদিন রঞ্জনকে ভুলাইয়াছে, রঞ্জনও সেই ফাঁদে ধরা দিয়াছে। ধরিবার এবং ধরা দিবার এই যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ ইহাকে প্রেম বলো আপত্তি নাই, কিন্তু নাম যাহাই হোক, নর-নারীর এই অবশ্যম্ভাবী আকর্ষণকে ফিজিওলজিক্যাল যৌথ-মিলন ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। মিলিরও তাহা জানা ছিলো, স্বপ্নবিলাসী রঞ্জনও ইহা অস্বীকার করিতে পারে না।

ঠিক এই কারণে রঞ্জন আজ বলিল, "আমাদের জীবনযাত্রায় ভবিষ্যৎকেই বা টেনে আনতে যাও কেন, কেন ভাবতে পারো না আমরা এসেছি এই তো আনন্দ, পৃথিবীতে আমাদের জায়গা কতটুকু আর তা বেছে নেবার জন্যই বা এত হ্যাংলাপনা কেন? বাঁচতে আমরা সবাই চাই, কিন্তু তারপর? তুমি থাকবে না, আমি থাকবো না—মানুষই যেখানে লুপ্ত হোয়ে গেলো, সেখানে আমাদের রেখে 'যাবারই বা কি

থাকতে পারে, নিয়ে যাবারই বা সার্থকতা কি? যতক্ষণ আছি, ফুল ফুটে থাকবো, গন্ধ ছড়িয়ে যাবো—তারপর এই পৃথিবী থেকে নিঃশেষে মুছে যাবো।

"তোমার কাব্য স্থষ্টি করো তুমি মনে মনে, ব্যবহারিক-জীবনে ওর কোনো দাম নেই।"

"দাম আছে নিশ্চয়ই, তবে সেটা নেবার মত মন সকলের নেই।"

"একদিন আমিও মনে করেছিলাম, এই বুঝি সব। কিন্তু আজ দেখছি, যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি তাকে অস্বীকার করা চলে না। গাছ বড় হয় ঐ মাটি থেকেই রস আহরণ ক'রে,—পৃথিবীর আলো বাতাস নইলে সে বাঁচে না। আমাকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় টেনেই এনেছো, প্রতিষ্ঠা করোনি। একদিন তুমিও দেখবে, তোমার আশপাশের বাতাস ভারি হ'য়ে উঠেছে।"

রঞ্জন হাসিয়া মিলির হাতখানি টানিয়া লইল। বলিল, "শক্ত কিছু বলবো না ব'লেই এমন কোরে তোমার হাতখানা টেনে নিলাম।"

"শক্ত কোরেই বলো না, তবু তো জেনে নেবো কি তুমি বলতে চাও।"

"ছি মিলি, মনের সবকথাই জোর কোরে জানতে চেয়ো না। একদিন অবন্তিকা বলেছিলো, আমার কাছে স্পষ্ট হও। কিন্তু একথা তোমরা কবে বুঝবে, মানুষকে বেশী স্পষ্ট করতে নেই। গায়ের কাপড়খানা আছে বোলেই তুমি আমার কাছে স্থন্দর, নইলে তোমাকে টেনে আস্তাকুঁড়ে নামিয়ে দিতাম।"

"কেবল কথার প্যাঁচ দিয়ে আমাকে ভোলাতে চাও, কিন্তু আজ আমি সবকথা পরিষ্কার জানতে চাই। সমাজকে বাদ দিয়ে যারা বাঁচতে চায়, তারা বাঁচে না—তিলে তিলে মরে, এ তুমিও যে না জানো এমন নয়, তবু কেনো যে আমাকে বিয়ে করলে না—সেও কি আমি বুঝিনি মনে করো। বিয়ে করবার সাহস যদি তোমার না থাকে তবে আমাকে ত্যাগ করো।

তোমার কাব্যের নায়িকা হোয়ে মানুষের সমাজে গণিকাবৃত্তি করবো—এ শাস্তি তুমি আমাকে আর দিও না, তোমার পায়ে পড়ি।”

মুহূর্তমধ্যে রঞ্জন নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইল। বলিল, অপ্রিয় কথা বোলে তোমাকে ব্যথা আর নাই বা দিলাম, তবে একটা কথা বোলে রাখি মিলি, শেষদিন পর্যন্ত মনে রেখো, বিয়ে করলেই সকল স্ত্রী সহধর্মিনী হয় না। যাক্‌, অনেক অপ্রিয় আলোচনা হয়ে গিয়েছে, রাত্রিটা ঘুমিয়ে নাও—আর এই রাত্রেই যখন আমরা কোন মীমাংসায় পৌঁছুতে পারবো না।

মিলি প্রায় টলিতে টলিতে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া খিল দিলো।

সকালবেলায় যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, রঞ্জন তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ একবার তাহার বুকটা ধক্‌ করিয়া উঠিল। কি জানি কেন, কি করিয়া তাহার মনে হইল, রঞ্জন বুঝি আর ফিরিবে না। একমুহূর্তে তাহার চোখের উপর বিশ্বের অন্ধকার নামিয়া আসিল। আজ তাহার এই সর্বপ্রথম মনে হইল, মেয়েমানুষের মত অসহায় বুঝি এ পৃথিবীতে আর নাই। একদিন সে গর্ব করিয়া বিলাত যাইতে চাহিয়াছিল—এখনো হয়ত যাইতে পারে, কুমারি-সমাজে একদিন সে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল—পিছন হইতে সকলেই দিয়াছে বাহবা, কিন্তু আজ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, যে-সংস্কারকে সে দুই পায়ে এতকাল ঠেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আজ তাহাকেই মানিবার জন্য তাহার ব্যাকুল-উন্মাদনা। আজ সে বুঝিয়াছে সমাজের গণ্ডীর বাহিরে একপাও তাহার যাইবার শক্তি নাই। আজ ঐ একটি মাত্র প্রাণীর অভাবে হয়ত সকলের কাছ হইতে তাহাকে চোরের মত পালাইয়া বেড়াইতে হইবে। বাড়িওয়ালাকে নোটীশ দিয়া চলিয়া যাইতে হইলে, সেও মুখ টিপিয়া হাসিবে, বন্ধুদের কাছে দাঁড়াইবার সেই উদ্ধত-স্পর্ধা আজ তাহার ধূলির সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। স্তব্ধঘরে মিলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া রহিল। বেলা বাড়িয়া চলিল, রঞ্জনের দেখা নাই।

হঠাৎ উঠিয়া সে উন্মাদের মত এ-ঘর ও-ঘর ছুটিয়া বেড়াইল। রঞ্জনের সমস্ত জিনিসই যথাস্থানে রহিয়াছে,—একটিও সে লইয়া যায় নাই। কিন্তু যে-মানুষটি এমন করিয়া অনায়াসে সবকিছু ফেলিয়া যাইতে পারিল, তাহার প্রতি মিলির আজ এতটুকু উদ্বেগ নাই,—কারণ মিলি জানিত, পুরুষ মানুষ—যত ধূলাই মাখিয়া আসুক না কেন, তাহাকে আহ্বান করিয়া লইবার মত লোকের অভাব কোনদিনই হইবে না। স্থান নাই শুধু মেয়েদের। মিলি একমুহূর্তে তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া লইল। চাকরটাকে ট্যাক্সি ডাকিতে বলিয়া কয়েকটি অতি-প্রয়োজনীয় জিনিস গুছাইয়া লইয়া সে মুহূর্তমধ্যে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু গোল বাধিল বাড়িওয়ালাকে লইয়া। বাড়িওয়ালা-জীবটি কিছুদিন হইতেই তাহাদের গতিবিধির উপর নজর রাখিতেছিল,—গতরাত্রির আলাপ-আলোচনাও তাহার কানে গিয়াছিল। মোটর আসিয়া দাঁড়াইতেই বাড়িওয়ালা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। পথ আগলাইয়া বলিল, যাবার পথ অত সোজা নয় বিবি!

"তার মানে? আপনি কি বলতে চান? মিলির স্বরে তীব্র ঝাঁজ।

"মানে অতি পরিষ্কার, বলি, আমি তো আজকের নই গো! কত দেখলাম, কত শুনলাম—তা যা করতে হয় কর গে, এ গরীবকে মারা কেন? ভাড়াটা দিয়ে যেখানে ইচ্ছে গেলে ভাল হোতো না।"

"আপনার কি ধারণা আমি পালিয়ে যাচ্ছি?"

বাড়ীওয়ালা আর-একবার দাঁত বাহির করিল, বলিল, আমার কাজ কি অতকথা জেনে। টাকা দাও, যা খুসী করো—আর এও বলি, তোমার ভাবনা কি বিবি—

"থামুন।"

মিলির ধমকে বাড়িওয়ালাকে থামিতেই হইল। তারপর সবিস্ময়ে

একসময় চাহিয়া দেখিল, মিলি ভাড়ার টাকা লইয়া তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

"নিন, রসিদ দিন।" রুক্ষস্বরে মিলি বলিল। তারপর রসিদ হাতে লইয়া বলিল, আমি বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছিনে,—মাস শেষ হোতেও দেরি আছে।

"তা বেশ তো, যতদিন ইচ্ছা থাকো—আর যাবেই বা কেন, রাজার অভাবে কি রাজ্য নষ্ট হয়।" বলিতে বলিতে তাহার দুই পাটি দাঁত আবার বাহির হইল।

মিলি চাকরটাকে ডাকিয়া রান্নার আয়োজন করিতে বলিল, তারপর গট্‌গট্ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

মিলি রাস্তায় আসিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন তাহার চোখে জল দেখা দিয়াছে। দুঃখে ক্ষোভে তাহার ঐ মাটির উপর আছড়াইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিল।

ড্রাইভার জানিতে চাহিল, কোন্ দিকে যাইবে? মিলি তদুত্তরে জানাইয়া দিল, যেখানে ইচ্ছা।

ড্রাইভার এইরূপ উত্তর শুনিতে অভ্যস্ত। বলিল, বহুৎ আচ্ছা।

মোটর ছুটিল, দক্ষিণে বালিগঞ্জের পথে। একটা আকস্মিক উত্তেজনায় মিলির সর্বশরীর তখনও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। কিন্তু কাঁপিতেছে কেন? একসময় নিজেকেই নিজে সে প্রশ্ন করে। সে তো বাঙালি-ঘরের সাধারণ মেয়ে নয় যে অল্প আঘাতেই ভাঙিয়া পড়িবে? বিস্তীর্ণ পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করিবার মত পায়ের বল তাহার আছে: তাহার রূপ আছে, তাহার যৌবন আছে আর আছে পুরুষকে তুচ্ছ করিবার মত অসাধারণ পারসোন্যালিটি।

অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মনে পড়িয়া গেল অমরেশকে। প্রথম-যৌবনে প্রেমে পড়িবার মত ছেলে সে,—যাহার হাতে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে নিজেকে

সঁপিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু বড় লাজুক,—এই লজ্জাই তাহাকে সচ্চরিত্র হইবার সুযোগ দিলো।

চৈত্রের দুপুর—বেশ মনে করিতে পারে সে,—সেদিন ছিলো চৈত্রের দুপুর। বাহিরে উত্তপ্ত বাতাস—ভিতরে তাহারা, অমরেশ ও মিলি। চমৎকার রোমান্স হইতে পারিত, কিন্তু ভীরু অমরেশ একটা চিলের ডাকে ভয় পাইয়া গেল। নারিকেল গাছের মাথার উপর একটা চিল নিতান্ত অরসিকের মত নিরন্তর ডাকিয়া চলিয়াছে। চৈত্রের উদাস-মধ্যাহ্নে এই বীভৎস চিলের ডাক—জানি না, আর কেহ শুনিয়াছে কিনা! দুপুরের গরম-হাওয়া পথ আর প্রান্তরের উপর দিয়া রাশি রাশি ধূলা উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে, ঘরের স্বল্পান্ধকারে জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আধ-ঘুমন্ত চোখে,—চিলের সেই সুতীক্ষ্ণ সরু আর কর্কশ ডাক শুনিলে কাহার না মনে হইবে, যেন কোন্ অশরীরি-আত্মা এই ঝোড়ো-হাওয়ার মধ্যে একটুখানি ছায়াশীতল আশ্রয়ের জন্য আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে!

অমরেশ বলিল, "আমার ভয় করছে!

মিলির বয়স তখন খুব বেশী না হইলেও সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়াছিল—আজো তাহার বেশ মনে আছে। সেই অমরেশ—যে-অমরেশ একটা চিলের ডাকে ভয় পায়, সে একদিন বিবাহের প্রোপোজ্যাল লইয়া আসিল। মিলি হাসিয়াই জবাব দিয়াছিল, কাপুরুষের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার আগে গলায় দড়ি দেবো। উত্তর শুনিয়া অমরেশ সজল চোখে ফিরিয়া গিয়াছিল। আজ তাহার সেই ছল ছল চোখ দুটি মিলির মনে পড়িল। অতি আকস্মিকভাবে মিলি ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরাইতে বলিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

গাড়ি আসিয়া থামিল রসারোডের একটি বাড়ির সম্মুখে। খবর পাইয়া অমরেশ বাহির হইয়া আসিল। বলিল, "কি খবর মিলি?"

"কথা আছে, আমার সংগে একবার গাড়িতে আসবে ?"

"তার পূর্বে ব্যাপারটা পরিষ্কার জানা দরকার।"

"নইলে কি তুমি যাবে না ?"

"তাই তো উচিত মিলি।"

"তবে থাক, তোমার গিয়ে কাজ নেই।"

অমরেশ মুহূর্তে কি ভাবিল, তারপর বলিল, "আচ্ছা আসছি।"

অমরেশকে লইয়া মিলি যখন তাহার বাসায় ফিরিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। চাকরটাকে খাবার আনিতে বলিয়া নিজে হাত-মুখ ধুইয়া 'ফ্রেশ' হইয়া ঘরে ঢুকিল। হাসিয়া অমেরেশের পাশাপাশি বসিল, বলিল, "অনেকদিন পরে দেখা,—নয় ?"

"হাঁ, অনেকদিন পরে দেখা। কিন্তু আমার সবই যেন আশ্চর্য ঠেক্‌ছে! কেনই বা তুমি আমার খোঁজে এলে,—এ ফ্ল্যাটই বা কার,—এ যেন আরব-উপন্যাসের একটি অধ্যায়!"

"বাঃ, তুমি তো বেশ কথা শিখেছো আজকাল! আগে তো মুখ-চোরা ছিলে,—Good."

অমরেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, মিলির সে সজ্জা-পারিপাট্য নাই। ও যেন রাতারাতি তপস্বিনীর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে! কোথায় গেল, প্যারিসের সেই ফ্যাসান-দোরস্ত মধুর বিন্যাস, সদম্ভ পদক্ষেপ, উদ্ধত গ্রীবা—অমরেশ অনেকক্ষণ্ ধরিয়া, চাহিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই পূর্ব-লালিমাও নাই!

মিলি হাসিয়া উঠিল। বলিল, "অমন কোরে চেয়ে চেয়ে কি দেখছো ?"

"দেখছি, তোমার মন-ভোলানো রূপ গেলো কোথায় ?"

"আমাকে অপমান করতে হয় করো,—কিন্তু আজ তোমাকে আমার সত্যিই প্রয়োজন।—আচ্ছা বোসো, আমি খাবার নিয়ে আসি,—আজ সারাদিন কিছু খাইনি।"

মিলির জীবনে ইহাও নূতন। অমরেশ অনেকদিক দিয়া অনেক রকমে ভাবিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কিছুই সুস্পষ্ট ধারণা তাহার মনে রেখাপাত করিল না। যে-মিলিকে সে জানিত, তাহার সহিত কোন মিলই আজ সে খুঁজিয়া পায় না,—মুখের হাসিটি পর্যন্ত তাহার এই কয় বছরে বদলাইয়া গিয়াছে। যে-মিলি একদিন বলিয়াছিল, উর্বশীর মত অনন্তযৌবন কবির কল্পনা নয়,—আমি দেখিয়ে দেবো, আমার মধ্যেও আছে সেই উত্তাপ। এই মিলিই একদিন তাহার পৃথিবীকে দুই পায়ে মাড়াইয়া গিয়াছে। আর আজ এই সামান্য ক'টি বছরে—

অমরেশের চোখের সম্মুখে ঐ ক'টি বছর যেন দুলিতে লাগিল।

মিলি খাবার লইয়া আসিল। বলিল, খাও।

"খাবার প্রয়োজন তো তোমারই।"

"নয় তো কি তুমি উপোস কোরে আমার বাড়িতে খেতে এসেছো, তাই বলছি। নাও, খাও—আমিও খাবো।"

অমরেশকে খাইতেই হইল।

অদ্ভুত একটা ম্লান হাসিতে মিলির মুখখানা ভরিয়া উঠিল। অমরেশ শংকিত হইয়া চাহিল। বলিল, "হাসলে যে?"

"একদিনের খাওয়ানোর কথা মনে প'ড়ে গেলো।"

"মনে পড়ে তাহ'লে?"

"মনে যদি না-পড়তো, তাহ'লে আজ এমন কোরে তোমাকে আনতে যেতাম না।"

অমরেশ যেন শুনিতেই পায় নাই এইভাবে বলিল, "কিন্তু আজ তোমাকে দেখছি এক অপরিচিত-পৃথিবীর মধ্যে যেন এইমাত্র তুমি এসে দাঁড়ালে—কোনোকালে ছিলো না তোমার সংগে প্রত্যক্ষ-পরিচয়,—যেন আমিও এসেছি এক-ঘুম পরে আরেকটা কোন্ গ্রহে নতুনতরো পরিবেশের মধ্যে।—বলতে পারো তুমি কে?"

মিলি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আজ অনেকখানি আমার বদল হোয়ে গেছে অমরেশ! আজ আমার মধ্যে সেদিনের মিলিকে খুঁজতে যেয়ো না—তাহ'লে ঠক্‌বে। আজকের আমি, শুধু আমিই। এর মধ্যে নাই উত্তাপ, নাই কোনো দম্ভ।"

"নাই বা খুঁজলাম তোমার মধ্যে কিছু। আমার সে আগ্রহ—তবে বলি শোনো, যাকে তুমি পাঁচবছর আগে দেখেছিলে, 'প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ কাঁদে' সে আমি আর নেই। তোমার প্রত্যাখ্যান আমি ভুলিনি মিলি। আজ মনে করতে পারি, তুমি ভালই করেছিলে।"

"কিন্তু ভাল করিনি অমরেশ।" বলিতে বলিতে মিলি উন্মাদের মত অমরেশের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দুই হাতের নিবিড় বেষ্টনে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই অস্ফুটকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ভাল করিনি অমরেশ, এ তুমি বিশ্বাস্ করো।"

অমরেশ ধীরে ধীরে তাগার হাত ছাড়াইয়া লইয়া শুধু বলিল, ছি।

একমুহূর্তে মিলি হিংস্র হইয়া উঠিল। বলিল, "ও, তুমি ভাল ছেলে—যত মন্দ আজ আমি! আমার ঘরে এসে আজ আমাকেই উপদেশ দিয়ে চ'লে যাবে ভেবেছো? কিন্তু ওগো সচ্চরিত্র! আমার একটি ডাকে এমন কোরে ঘর ছাড়লে তবে কিসের লোভে? যাকে তুমি মূর্তিমতী ভাল্‌গার বোলে একদিন বিদ্রূপ কোরেছিলে,—আজ কোন্ আশায় আমার পাশাপাশি বোসে এতটা পথ এলে? আমার এই পাঁচ বছরের নিরুদ্দেশ-কাহিনী—যা একদিন তোমাদেরই সান্ধ্য-টেবিলে রোমাঞ্চ জুগিয়েছিলো, আজ জেনে শুনে কোন্ পরমার্থ লাভের আশায় আমার সংগ নিলে?"

"কোনো লোভেই আজ আমি তোমার সংগ নিইনি। তুমি আমার আসাটাকে যেভাবেই ব্যঙ্গ করো না কেন, যত কুৎসিত কথাই তোমার মুখে আসুক,—আমি তোমার বিপদ বুঝেই এসেছিলাম।"

"বিপদ তো কত রকমের হয় অমরেশ। না, তুমি শুধু ভেবেছিলে, অর্থহীনাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য কোরে বুক ভ'রে আত্মপ্রসাদ নিয়ে সগর্বে ফিরে যাবে?"

সত্যই তো,—অমরেশ ইহার কি উত্তর দিবে? মিলির আহ্বানকে সে কোনদিক দিয়াই উপেক্ষা করিতে না পারিয়া নিতান্ত নির্বোধের মতই তাহার পাশে বসিয়া আসিয়াছে। সে তো বলিতে পারিত, কিছুতেই যাইবে না। কোন লোভই যদি তাহার ছিলো না, তবে কেন সে অহেতুক এমন কাজ করিয়া বসিল? এখন যেমন করিয়াই সে ঘুরাইয়া বলুক, ইহার প্রচ্ছন্ন কদর্থ টাই ঘুলাইয়া উঠিবে। কেহ বুঝিতে চাহিবে না কি তাহার উদ্দেশ্য,—কেন সে আসিয়াছিল!

অমরেশকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মিলি বলিল, "শোনো, আমার যা বলবার আছে। আজ দুবছর রঞ্জনকে নিয়ে ঘর ছেড়েছি। নর-নারীর মিলনের মধ্যে বিবাহের প্রয়োজনকে আমি কোনদিনই স্বীকার করিনি—আজও যে স্বীকার করি এমন নয়। কিন্তু চেয়ে দেখলাম, সমাজকে তুচ্ছ করতে গিয়ে সমাজেরই নাগাল পেলাম না। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই হারালাম—কিন্তু আর আমি হারাবো না অমরেশ,—এই সামাজিক-অপমৃত্যুর হাত থেকে আজ আমি বাঁচতে চাই।"

মিলি এই পর্যন্ত বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, "একদিন তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে—"

বাধা দিয়া অমরেশ বলিল, "সেদিনের কথা থাক্,—তোমার অধঃপতনকে আজ অনুকম্পা করতে পারি, প্রশ্রয় দিতে পারি না।"

মিলি দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "ও, আমার অধঃপতন! কিন্তু সব জেনে শুনেও তুমি এখানে কি করতে এসেছো সাধুপুরুষ? আমাকে

সবাই মিলে জোর কোরে নরকেই যদি নামাবে মনে কোরে থাকো—তবে, তোমাকেও নামতে হবে। দূরে দাঁড়িয়ে হাততালি দেবে, আর নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করবে, সে-সুযোগ তোমাকে আমি দেবো না।" বলিয়া উন্মাদের মত মিলি অমরেশের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অমরেশ প্রাণপণ-শক্তিতে নিজেকে সেই অক্টোপাশের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিলি ক্ষুব্ধ-আক্রোশে আহত ফণিনীর মত গর্জন করিতে লাগিল।

বাহিরে অল্প অল্প তখন বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিয়াছে। রাত্রি অধিক না হইলেও লোক চলাচল থামিয়া গিয়াছে,—কেবল দু-একটি রিক্সার ঠুন্ ঠুন্ শব্দ আষাঢ়ের সজল-সন্ধ্যাকে মুখর রাখিয়াছে।

ঠিক এইসময় বাড়িওয়ালা দাঁত বাহির করিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

মিলি গর্জন করিয়া উঠিল, "আপনি এখানে কেন? আবার আপনার কি প্রয়োজন? ভাড়া তো আপনার—

বাড়িওয়ালা এক হাত জিভ বাহির করিয়া বলিল, "ছি ছি,—সে কি কথা! ভাবলাম, সেই সকালে বেরিয়েছো,—দেখি একবার খোঁজ নিয়ে। বাড়িতে আছো, খবরাখবর নেওয়া তো দরকার,—মানুষের বিপদ-আপদও তো আছে।"

"হাঁ, তা আছে—আপনি যান।"

বাড়িওয়ালা আড়চোখে অমরেশকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, "তা বেশ হয়েছে—তাইতো বলি, তোমার আবার ভাবনা কি!"

"আপনি যাবেন, না, আমাকেই চেষ্টা করতে হবে?"

"না, না, চেষ্টা করতে হবে কেন।" বলিতে বলিতে বাড়ীওয়ালা ক্ষিপ্রপদে সরিয়া গেল।

অমরেশ এতক্ষণ নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলিল, "এ-বাড়িওয়ালাও কি তোমার নিজের সৃষ্টি?"

"আমি এতটা নিচে এখনো নামিনি অমরেশ, তা হোলে চেঁচিয়ে পাড়ার লোক ডাকতাম। কিন্তু যাক্, অনেক কেলেংকারি হয়েছে, তোমাকে ছুটি দিলাম, তুমি এবার যেতে পারো।" বলিয়া মিলি তাহার শয্যার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

অমরেশ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। পালাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিল না।

বাহিরে তখন মুষলধারে বর্ষণ সুরু হইয়াছে। জানালার ধারে আসিয়া অমরেশ একবার বাহিরের দিকে চাহিল। একবার তাহার চিৎকার করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করিল, তারপর যে-হাস্যকর ইচ্ছাকে সে দমন করিল, তাহাকে এই অধ্যায়ে আর নাই বা টানিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইল। যেমন করিয়া প্রতিটি রাত্রি প্রভাত হয়। ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই ছিলো না—নূতনত্ব ছিলো শুধু অমরেশের জীবনে, এরূপ-রাত্রি তাহার প্রথম, আর প্রথম বলিয়াই অনাস্বাদিত সেই-রাত্রি অমরেশের জীবনে প্রভাত হইল।

নীচে—রাজপথে জীবন-যাপন প্রচেষ্টায় মানুষের ছুটাছুটি হইল সুরু, গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে প্রভাতের তপস্যা ভংগ হইল।

সদ্য ঘুম ভাঙিয়া অমরেশ এই নূতন-প্রভাতের দিকে চাহিল। গত-রাত্রির লজ্জাকর-ঘটনাকে তাহার স্বপ্ন বলিতে ইচ্ছা করে—হয়তো স্বপ্ন হইলেই ভাল হইত, আনন্দময়, রোমাঞ্চময় স্বপ্ন।

অবশ্য ইহার কারণও আছে। মেয়েদের সহিত ঘন-পরিচয় কোনো-দিনই ছিল না অমরেশের। সিনেমায়, কাগজে-দেখা এবং ব'য়ে-পড়া মেয়েদের লইয়াই এতদিন তাহার কাল্পনিক-জগত গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের লইয়া সে তর্ক করিত, তাহাদের লইয়া করিত স্বপ্ন-বিলাস।

আধুনিক-যুগের ছেলেদের মত সে সত্যকার রক্তমাংসে-গড়া মেয়েদের সহিত মিশে নাই। সুযোগ হয়তো আসিয়াছিল, সুবিধাও হয়তো হইতে পারিত—চরিত্রের এই দুর্বল-দিকটাকে সে লালনই করিয়া আসিয়াছে, যত্নপূর্বক তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া চারিত্রিক-দৃঢ়তার পাবলিসিটি করিতে তাহার ভাল লাগিত। সে কোনদিন স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই ইহা তাহার দৃঢ়তা নয়, মনের প্রচ্ছন্ন-বাতব্যাধি। যাহাকে চলিত কথায় বলা হয় নার্ভাস্‌নেস।

সেই অমরেশের আজ রাত্রি প্রভাত হইল মিলির সহিত একই শয্যায়! আশ্চর্য সে! এবং আশ্চর্য তাহার বিধাতা!

কিন্তু অমরেশ নির্বোধ নয়। যে-অক্টোপাশের বন্ধন তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, এবং যে-বন্ধনপাশ হইতে আশু-মুক্তির সম্ভাবনাও তাহার নাই, তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া অমরেশ মিলিকে ভুলাইল।

মিলি চা লইয়া আসিয়া বলিল, "রাত্রে ঘুম হয়নি,—নয়?"

"ঘুমুতে কি তুমি দিয়েছো?"

"ও, এখন সব দোষ বুঝি আমারই? নাও, চা খেয়ে নাও,—নইলে ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।" বলিয়া মিলি পরম নিশ্চিন্তের মত তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

অমরেশ সেইদিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "একবার বাড়ি যাবার ছুটি দাও, নইলে ভাববে যে!"

"ভাববার কে আছে তোমার শুনি?"

"ভাববার লোক আছে বই কি। এতকাল—সেই ছোটো থেকে যাদের কাছে মানুষ হয়েছি, মা, দিদি, ভাই, বোন তারাই ভাববে।"

"কিন্তু সবাই একথা ভাববে না, তুমি ছেলেমানুষ পথ ভুলে অন্য কোথাও চ'লে গিয়েছো।"

"বিপদের কথাও তো মনে হোতে পারে।"

"একখানা চিঠি লিখে খবরটা দাও না, ভাল আছি।"

"বেশ, তাই হবে।"

"রাগ করলে ?"

"না।"

"ঠিক তো ? তাহ'লে সেই বেশ,—কেমন ?"

"বেশ।"

"কিছু খাবে এখন ? কাল তো ভাল কোরে খাওয়া হয়নি।"

"দাও।"

"আচ্ছা, তুমি কি কিছু বলতেও জানো না। খিদে লেগেছে—তাও আমাকে ব'লে দিতে হবে!" বলিয়া মিলি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অমরেশ বিহ্বল-নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ও ঠিক সেই ধরণের পুরুষ, যে মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে, দাবী করিতে জানে না—যে না-পাইলে কাঁদিয়া ভাসায়, প্রতিবাদ করিতে পারে না।

এরূপ পুরুষ মিলিরও সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন পুরুষ সে দেখেনি : মেয়েদের সামনে লজ্জায় যে মাথা তুলিতে পারে না, যে আদেশ করে না, অভিযোগ করে না, অধিকার করে না—বোধ হয় প্রত্যাশাও করে না, শুধু অনুগ্রহের সম্মুখে অঞ্জলি পাতিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু এই তো বেশ। মিলি যেন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বলিল, "বোসো, খাবার নিয়ে আসি।"

অমরেশ উঠিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল। দিনের আলোয় সে যেন আজ নিজেকেও নূতন করিয়া প্রত্যক্ষ করিল। একটি রাত্রির আকস্মিক দুর্ঘটনায়—হাঁ, দুর্ঘটনাই তো, ছন্নছাড়া সে যেন কোন্ নূতন গ্রহ-বিপ্লবে কক্ষান্তরে ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে। এ-পৃথিবীর সহিত

অন্য-পৃথিবীর যেন কোনো যোগাযোগ নাই,—সেও কাহারও নয়, উহারাও তাহার নয়। আলো-বাতাসে সে উহাদেরই মত বাঁচিয়া আছে, উহাদেরই মত ক্ষুধা পাইলে তাহাকে খাইতে হয়, সে হাসিলে হাসিতে পারে, কাঁদিলে কাঁদিতে পারে,—শুধু পারে না, এই পা দুটাকে ইচ্ছামত চালনা করিতে।

অমরেশ পা দুটাকে একবার প্রবলভাবে নাড়া দিলো, সে কি পংগু হইয়া যাইতেছে ?

"ও আবার কি হচ্ছে ? পায়ে লাগলো না কি ?" বলিতে বলিতে মিলি খাবার লইয়া প্রবেশ করিল।

"না, লাগেনি। একবার নেড়ে-চেড়ে দেখছি।"

"পালাতে পার কিনা পরীক্ষা করছো ?"

"না, কারণ আমি জানি,—শুধু পা দুটো থাক্‌লেই সবসময় পালানো যায় না।"

"যাক্ শুনে আশ্বস্ত হ'লাম। সত্যি, ভয় করে অমরেশ,—আমার একথা আজ তুমি বিশ্বাস করো, আমি সব পারবো, তোমাকে হারাতে পারবো না।"

অমরেশ চুপ করিয়া গেল। এই চুপ করিবার অসাধারণ শক্তি অমরেশের আছে। সে ইচ্ছা করিলে অনন্তকাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে,—লাজুক অমরেশ, বিনীত অমরেশ,—কিন্তু সে নির্বোধ নয়।

বৈকালিক-প্রসাধন শেষ করিয়া মিলি যখন অমরেশের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখন অমরেশের সবে ঘুম ভাঙিয়াছে। বলিল, "বাবা রে বাবা, কি ঘুমুতে পারো তুমি ?"

"ঘুমটা আছে ব'লে আজও বেঁচে আছি।"

"মানে কি হোলো ?"

"সব কথারই কি মানে থাকে।

"না থাক্ চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।"

"বেড়াতে! অমরেশ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল। কিন্তু বাড়ির বাইরে যেতে আমার আর সাহস নেই।"

"সাহস নেই, না, আমাকে নিয়ে বেরোতে তোমার লজ্জা করে?"

"লজ্জা আর আমার নেই।"

"ঠিক বলছো?"

"হাঁ, তা ছাড়া, এই ঘরটা ছেড়ে আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।"

"বেশ, না হয় নাই গেলে।"

"কিন্তু তোমার এই সাজ যে বৃথা হোয়ে গেলো।"

"সাজ তো তোমার জন্যেই। বাইরের কথা ভেবে তো সাজিনি।"

"এই কথাটা তোমার মিথ্যা হোলো মিলি। সাজ মেয়েরা বাইরের জন্যেই করে। তার জন্যে প্রয়োজন রং বেরং-এর শাড়ি, দেশ-বিদেশের ফ্যাসান, সোনার গয়না, রুজ লিপস্টিক।"

"আমাকে তুমি অপমান করছো?"

"অপমান?" অমরেশ হাসিয়া বলিল, "অপমান তোমাদের কিছুতে হয় না,—ওটা বানানো কথা।"

মিলি রাগ করিয়া চলিয়া গেলো। অমরেশ হাসিল। হাসিল বটে, কিন্তু মনে মনে তারিফ না করিয়া পারিল না। সজ্জা-উপকরণ থাকিলেই যে সকলে সাজিতে পারে এমন নয়। সেই সংগে নিজেকে সাজাইবার কৌশলও জানা দরকার। মিলি সাজিতে জানে,—নিজেকে অপরূপ করিয়াই সাজিতে জানে। তার উপর আছে মিলির দেহ-সৌষ্ঠব,—ভগবান যেন তাহাকে নিখুঁৎ করিয়া গড়িয়াছেন। সেই মিলি যখন রং মাখিয়া অপরূপ সজ্জায় নিজেকে বিন্যাস করে, তখন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ফিরাইয়া দিবার মত বল বুঝি কাহারও

নাই। একটি চলমান-নক্ষত্র যেমন তাহার যাবার-পথকে আলোকিত করিয়া করিয়া চলে, মিলিও চলে সবার অলক্ষ্যে পুরুষেরই বুকে এক বিহ্বল বেদনার তীর হানিয়া।

অমরেশ জানে এই আগুন শুধু দগ্ধ করিতেই আসে,—ঘরে আনিয়া তাহাকে কাজে লাগাইবার দুঃসাহস না করাই ভাল। মিলি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাইতো অমরেশ অমন করিয়া হাসিতে পারিয়াছে।

কিন্তু মিলি রাগ করিতেও যেমন জানে, আবার রাগ ভাঙাইতেও জানে তেমনি। ঐ অমরেশকে দিয়াই মিলি তাহার রাগ ভাঙাইল।

মিলি হাসিয়া বলে, "কেমন, বলবে অমন কথা?"

"শুনবার সাহস থাকলে বলতাম। কারণ জানি, সে-সাহস তোমার নেই। এই আধুনিকতা নিয়ে তুমি বিলেত যাচ্ছিলে! যাওনি ভালই করেছো, নইলে বাংলাদেশের মুখ পুড়িয়ে আসতে।"

"আর কোনো সাহসই আমার কোরে কাজ নেই। তোমরাই তো বাহবা দাও পিছনদিক থেকে,—তারপর ফিরেও চাও না।—নাচাতেই পারো, নাচতে জানো না।"

"কিন্তু আজ আমাকে দেখলে ঠিক উল্টোটি মনে হবে,—তুমিই নাচাচ্ছো, আমি নাচছি।"

মিলি হাসিয়া ফেলিল। বোধহয় একটু লজ্জাও হইল। বলিল, "কথা কি জানো, ওখানেই আমাদের আনন্দ। পুরুষকে আপন আয়ত্বে আনবার প্রচ্ছন্ন-চেষ্টা প্রত্যেক মেয়েরই আছে, তবে প্রয়োগ-কৌশলের অজ্ঞানতায় কোথাও কোথাও 'ভালগার' হোয়ে পড়ে।"

"সেই 'ভালগারিজম্' তোমার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে, যেটা আমি এতক্ষণ ধ'রে বলতে চেষ্টা করেছি। এমনি কোরেই মেয়েদের

পুরুষের প্রতি লোলুপতা যায় বেড়ে,—যার ফলে তাদেরকে অনেক নিচে নেমে যেতে হয়।”

মিলি শিহরিয়া উঠিল। বলিল, “তুমি সত্যি বলেছো অমরেশ,—এমন কোরে কেউ আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়নি। আজ বুঝতে পারছি, কোথায় এসে আমি নেমেছি,—আজ বুঝতে পারছি, বাড়িওয়ালা কোন্ সাহসে আমাকে অপমান কোরে যায়।”

বলিতে বলিতে মিলি অমরেশের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িল: “তুমি আমাকে রক্ষা করো অমরেশ, তোমার ঐ নরকের-পথে ঠেলে দিও না।

ঠিক এই সময় রঞ্জন আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল, “একটি দিনের সবুর সইলো না—”

মিলি আতংকে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, “তুমি—তুমি কোত্থেকে এলে?”

রঞ্জন দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, “This is the tragedy মিলি, সংসার তুমি চাইলে, কিন্তু সংসার তোমাকে চাইলে না। এ তোমার ভাগ্যলিপি: অনন্তযৌবনা উর্বশীর এই সনাতন-লিপি।”

রঞ্জনের পিছনে কে যেন খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মিলি চাহিয়া দেখিল, বাড়িওয়ালা তাহারই দরজার সম্মুখে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। মিলি একমুহূর্ত কি ভাবিল, তারপর দৃপ্তার মত সোজা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু উঠিয়াই দেখিল কোন্ এক দুর্লভ-অবসরে অমরেশ তাহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কঠিন নির্বিকার মুখে অবন্তিকা পঙ্কজের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। পঙ্কজের কথার জবাবে অবশেষে বলিল, "না আপনার কথা ঠিক নয়। কতকগুলো প্রতিশব্দ মেয়েদের বিরুদ্ধে আপনারাই ব্যবহার কোরে বাহবা নিয়ে আসছেন। মেয়েদের মনের কথা আমার চাইতে তো আপনার জানবার কথা নয়। আমি জানি তারা ঘর ছাড়ে পেটের দায়ে। মেয়েদের ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলা চলেছে মানুষের সমাজে—জুয়া নয় তো কি, যখন নিজেই জানি না কার হাতে গিয়ে পড়বো। গিয়ে পড়লাম যখন, তখন দেখি দুবেলা দুমুঠো ভাতের বেশী আমার আর-কিছু বরাদ্দ নেই—তাও জোটে দুবেলা ঝাঁটালাথি খেয়ে। এও স'য়ে যে টিকে গেলো সে আপনাদের কাছে বাহবা নিলে, আর যে তা না-পারলে ?"

"আপনিই বলুন শুনি।"

অবন্তিকা হাসিয়া বলিল, "তখনই তো আওড়ান 'হ্যাভ লক এলিস', 'ফ্রয়েড'—নইলে আপনারা দাঁড়াতেন কোথায় ?"

"সবই না হয় বুঝলাম, কিন্তু আপনার এসব তো জানবার কথা নয়।"

"কেন, বড়লোকের মেয়ে বোলে ? এর নাম জাতিগত অনুভূতি—তাছাড়া, সব-কিছুকেই যে অভিজ্ঞতা থেকে জানতে হবে এমনই বা মানবো কেন ? তবে একথা স্বীকার করবো, মেয়েরা বড্ড বেশী লোভী। ত্রিশ টাকার কেরানি হেসে-খেলে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ত্রিশ টাকার কেরানি-স্ত্রী তা পারে না। সে চায় গা-ভরা গয়না, রং-বে-রং-এর কাপড়, চায় আরাম, চায় ঐশ্বর্যের পাবলিসিটি। সেদিকের এতটুকু ত্রুটি সে সইতে পারে না,—তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে অমন কোরে মনিমুক্তার আহরণে।"

"আপনার যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারিনে,—কিন্তু সেই সংগে মানুষটাকে বাদ দিলেই বা চলবে কেন যিনি এই উপকরণ যোগাচ্ছেন ?"

"বাদ তো দি'নি, তবে তাকে প্রধান বলতে আপত্তি আছে।"

"কিন্তু ইস্কুল কলেজের মেয়েরা ? তাদের স্খলনকে কি নাম দেবেন আপনি ?"

"কিন্তু একথা কি আপনি জানেন, মেয়েরা পুরুষদের ঘৃণা করে ? অবশ্য বলতে পারেন ঘৃণা ভালবাসার আর-একটা রূপ। যে যাকে বেশী ভালবাসে সে তাকে ততোধিক ঘৃণা করে। এই ঘৃণা যেখানে নেই, সেখানে ভালবাসাও নেই। ছেলেদের হ্যাংলাপনায় মেয়েরা আমোদ পায় —সেই আমোদের বিচিত্র অভিব্যক্তি—যাকে আপনারা আধুনিক ভাষায় বলতে সুরু করেছেন ফ্ল্যাটারিং, এই ফ্ল্যাটারিং-এই তাদের আনন্দ, নবোদ্ভিন্ন-যৌবনের নবতম শিহরণ। কিন্তু আর নয়, এ আলোচনা করতে আমি লজ্জা পাচ্ছি।—আপনার নাটক লেখার কি হোলো ?"

"নাটক আরম্ভ করিনি সত্যি, কিন্তু তার কাঠামোটা ঠিক আছে। যদিও জানি না, শেষটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে।"

"শেষের ভাবনা নাই বা ভাবলেন, তাহোলে কোনোকালে কাজ আরম্ভই করতে পারবেন না। লিখে যান, তার পরের কথা পরে।"

"আজ পিসীমা গেলেন কোথায় ?" বলিয়া পঙ্কজ নিজেকে হাল্কা করিবার চেষ্টা করিল।

"যদি বলি পিসীমা বাড়ি নেই ?"

"নাই বা থাকলেন তাতে ভয় করবার কি আছে ?"

"ভয় করবার নেই নাকি ? এত বড় বাড়িটায় একা কুমারি-মেয়ে আমি—

"ও, এই কথা !" বলিয়া পঙ্কজ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"এতে হাসবার কি হোলো ? লোকে দেখলেও তো নিন্দে করবে।"

"লোকনিন্দার কি কোন মানে হয়! আগে বলুন, আপনার কোথাও বাধছে কিনা?"

"বারে, আমার আবার কোথায় বাধতে দেখলেন।"

"বাধাই যদি নাই, তবে এমন সময় আপনার পিসীমার কথা মনে এলো কেন?"

"পিসীকে মনে করবার বুঝি সময়-অসময় আছে?" বলিয়া অবন্তিকা মুখ টিপিয়া হাসিল।

পঙ্কজ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "কোন অবস্থাকেই আমি ভয় কোরতে জানি না।"

"তাইতো দেখছি।" বলিয়া অবন্তিকা আবার হাসিল। এত সাহস ভাল নয় কিন্তু।"

"আপনার কথার অর্থ কি? বুঝতে পারছি, পিসী নাই—এই কথাটাই আপনি কোনো অবস্থাতেই ভুলতে পারছেন না। এখন দেখছি সংশয়টা আপনারই, আমার নয়।"

"ভুল বুঝেছেন পঙ্কজবাবু। নিজেকে নিয়ে বিব্রত হবো, এমন মেয়ে আমি নই। তাছাড়া আপনাকে চিনবার অবসরও আমি পেয়েছি। লেখাপড়া শিখে এটুকু অন্তত বুঝেছি, নিজে খারাপ না হোলে কেউ তাকে খারাপ করতে পারে না। কিন্তু কথা কি জানেন, আপনাদের জ্ঞানাঙ্কুর-বাবু লোকটি সুবিধের নন,—বিষ তিনিই ছড়াবেন, ক্ষতি কোরতে পারুন আর নাই পারুন।"

"তার চেয়ে এক কাজ করি না, আমি চ'লে যাই। অপরকে বলবার সুযোগই বা দেবো কেন আমরা।"

"কেন, ভয়ই বা করতে যাবো কেন—যেখানে কোনো অপরাধই আমরা করিনি।"

"না, না, পিসীমাও হয়তো ভুল বুঝতে পারেন।"

"পিসীমা কোনো অবস্থাতেই ভুল করেন না। তিনি জানেন, আমি কোনো অন্যায়ই কোরতে পারি না।" বলিয়া অবন্তিকা হাসিল।

"আচ্ছা, মিছিমিছি আমাকে ধ'রে রেখেই বা লাভ কি বলুন?"

"জগতে একমাত্র লাভ ছাড়া বুঝি কেউ কাউকে ধ'রে রাখে না?"

"তবে, কেন ধ'রে রেখেছেন বলুন?" বলিয়া পঙ্কজ হাসিল।

"একা একা থাকবো, তবু তো দুদণ্ড কথা কোয়ে বাঁচলাম।"

"সেটাও কি লাভ নয়?"

অবন্তিকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "এ আপনার ঝগড়া করবার তর্ক।"

"ঝগড়া আমি কারুর সঙ্গে করি না।"

"এই তো কোরছেন।—আচ্ছা, এক কাজ করুন,—আপনি গাইতে পারেন?"

"কেন, গান গাইবো বলছেন?"

"হাঁ, মন্দ কি,—তবু খানিকটা সময় কাটবে।"

"আমাকে নিয়ে কি শুধু সময় কাটাতেই চান? আমার নিজের দাম যে এত অল্প তা আগে জানিনি।"

"আমি জানিয়ে দিলাম,—তাই বুঝি জানলেন?" অবন্তিকা বলে আর হাসে।

"দেখুন, 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো' বোলে একটা কথা আছে,—অসময়ে যারা কাজে লাগে তারা হোলো ঠিক তাই।" একটা প্রচ্ছন্ন-হাসির আভাষ পঙ্কজের মুখে।

অবন্তিকা একবার সেইদিকে চাহিয়া লইয়া মাথা নত করিয়া বলিল, "কিন্তু ঐ ভাঙা-কুলোর দামই সংসারে সব চাইতে বেশী!"

"দাম ক'যে কখনো দেখিনি, তবে এইটুকু বলতে পারি, আমাকে বেশী প্রশ্রয় দেবেন না।"

"কেন, আপনি বাঘ না ভালুক ?"

"তার চেয়েও ভয়ংকর।"

অবন্তিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"দেখুন, আপনার এই হাসিটি আমার বেশ ভাল লাগে।"

অবন্তিকার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে একটি মুহূর্ত,—নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "হাসি আবার কার না ভাল লাগে।"

"না, না, এ সে-হাসি নয়। অনেক মেয়ে আছে, যারা হাসে ওজন কোরে। কতটুকু হাসা উচিত, আর কতখানি নয় তার পরিমাপটা থাকে তাদের মনে। আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে সেই সব মেয়ে।"

অবন্তিকা হাসিয়া বলিল, "আপনার দেখতে না-পারায় তাদের ভারী ব'য়েই গেলো। আর ক'টা মেয়েকেই বা আপনি দেখেছেন ?"

"তা দেখেছি বই কি,—পথে, ঘাটে,—ইস্কুলে, কলেজে।"

"তবে তো খুব দেখেছেন। ও দেখার কোন মানে হয় না। আমাকে যেমন কোরে দেখলেন দিনের পর দিন একটু একটু কোরে—এমন দেখেছেন কোন মেয়ে ? তারপর আরো একটা কথা আছে,—সকল জোরে হাসিই সরল হয় না। আপনি জানেন কিনা জানি না, মেয়েরা কুটিলার জাত,—তাদের ফস্ কোরে অমন জোরালো সার্টিফিকেট দিয়ে বোসবেন না।"

মুহূর্তে পঙ্কজের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অবন্তিকার কথা মানিতে হইলে, তাহার মাকেও কুটিলার জাত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সে যেমন করিয়া তাহার মাকে জানে, ঐ অবন্তিকা, যত বড়াই করুক না কেন, সে উহাদের কতটুকু জানে ? তাই পঙ্কজ এক-সময় বলিল, "আপনার কথা সত্য নয়,—আমি আমার মাকে জানি, তাঁর তুলনা হয় না।"

অবন্তিকা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল,

একি আশ্চর্য ছেলেমানুষ! তারপর দুঃখিত হইয়া বলিল, "আপনি এতটা আঘাত পাবেন জানলে বোলতাম না। তবে আপনি বড় ছেলেমানুষ, সমষ্টি নিয়ে যেখানে কথা সেখানে ব্যক্তিকে নিয়ে আসেন কেন? আমিও তো আমার পিসীকে কম শ্রদ্ধা করিনে পঙ্কজবাবু!"

পঙ্কজ বুঝিল, অন্যায় তাহারই! তাই নিজের ভুল সংশোধন করিতে খপ করিয়া অবন্তিকার হাত ধরিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

অবন্তিকার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "আঃ, হাত ছাড়ুন।"

পঙ্কজ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "ও অন্যায় কোরে ফেলেছি তো। কিছু মনে করবেন না।"

"আমি মনে নাই বা কোরলাম, কিন্তু লোকে দেখে ফেললে কি ভাবতো বলুন তো?

"তা সত্যি, খুব অন্যায় বলতো। আচ্ছা আর হবে না।"

"হবে না তো?" বলিয়া অবন্তিকা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"সভ্য-সমাজের বিধি-নিষেধগুলো সব সময় আমার মনে থাকে না—অথচ, বেশ জানি, ও-গুলোর প্রয়োজন অনেকখানি। আপনি কিছু বোললেন না, কিন্তু আর কেউ হোলে হয়তো মারই খেতে হোতো।"

"নিশ্চয়ই। তাও আবার কোমল হাতের চড় নাও হোতে পারতো—হয়তো দারোয়ানের ডাক পড়তো।" অবন্তিকা বলে আর হাসে।

মহামায়াকে লইয়া জ্ঞানাঙ্কুর যখন প্রবেশ করিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অবন্তিকা হাসিয়া বলিল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কি আমাদের ভুলে গিয়েছিলে পিসীমা?

মহামায়াও হাসিলেন। বলিলেন, তাঁরা তো আর আসতেই দেবেন না বলছিলেন।

"ইস্, তা বই কি! তিনবছর হোয়ে গেলে তামাদি হোয়ে যায়,

জানেন না তাঁরা ? তোমার তো তিনবছরের বেশী হোয়ে গেল বাপের বাড়িতে থাকা।”

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পঙ্কজ বলিল, ঠিক বোলেছেন, পিসীমার ওপর তাঁদের আর কোনো ‘রাইট’ নাই।

জ্ঞানাঙ্কুর ইহাদের সহিত হাসিতে যোগ দিলো বটে, কিন্তু শূন্য-বাড়িতে পঙ্কজের সুদীর্ঘ উপস্থিতি তাহার অন্তরে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। প্রকাশ্যে কিছু বলিবার অধিকার তাহার না থাকিলেও, সে বিষ উদ্গীরন করিতে ছাড়িল না। তাই একসময় শ্লেষ করিয়াই বলিল, পঙ্কজ ভায়ার কি আজ ছুটি ছিলো না কি ?

পঙ্কজ না বুঝিলেও এ-ইঙ্গিত অবন্তিকা বুঝিল। তাই সেও কটাক্ষ করিয়া জানাইয়া দিল, হাঁ, আজ ওঁর ছুটি ছিলো ব’লেই তো সারাদিনটা এখানে কাটিয়ে যেতে পারলেন। আবার আসছে রোববারে আমাকে নিয়ে বোটানিকেলে যাবেন বোলছেন।

জ্ঞানাঙ্কুর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, বেশ. বেশ, বোটানিকেল খুব ভাল জায়গা,—ভায়ার রুচিবোধ আছে।

মহামায়া বলিলেন, পঙ্কজকে চা দিয়েছিস অবন্তি ?

“ঐ যাঃ, চা বোধ হয় আপনাকে দেওয়াই হয়নি—না ? কি কোরেই বা হবে বলুন, কথা বলতে আরম্ভ করলে তো আর আপনার থামবে না। তা ছাড়া, যা কাণ্ড করলেন আজ ! অমন অবস্থায় পড়লে চা দেবার কথা মনে থাকে কখনো !”

অত্যন্ত আকস্মিক জ্ঞানাঙ্কুরের মনে পড়িয়া গেল, নিচের দরজা খোলা রাখিয়াই সে উপরে আসিয়াছে, তাই ব্যস্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা ব’সো ভায়া, নিচের দরজা আবার খোলা রেখে এসেছি। বলিয়াই সে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

অবন্তিকা হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইল।

'কী যে ছেলেমানুষী করে!' বলিয়া মহামায়াও হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

"একটা কথা কি জানেন পিসীমা, ছেলেমানুষী ওটা প্রকৃতির ধর্ম। চেষ্টা কোরে যেমন শেখাও যায় না তেমনি শোধরানোও যায় না। আমাকেও ঠিক ঐকারণে অনেক জায়গায় ঠক্‌তে হয়। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলাম না, জ্ঞানাঙ্কুরবাবু হঠাৎ আমাকে অমনভাবে আক্রমণ করলেন কেন?"

"সে-অন্যায় করবার যে ওর এতটুকু অধিকার নেই, সেইটেই ও আজো জানলে না। জানলে, অমন কোরে আজ বলতে পারতো না।—আচ্ছা, তুমি ব'সো—আমি চা নিয়ে আসি।" বলিয়া মহামায়া যেন পালাইয়া বাঁচিলেন।

অবন্তিকা যখন ঘরে আসিল, তখন পঙ্কজ চলিয়া গিয়াছে। পঙ্কজ কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবে ইহা যেন বিশ্বাস করিতেই ইচ্ছা করে না। কিন্তু পঙ্কজ চলিয়া গেল, ইহাও সত্য। অবন্তিকা বাহিরের জানালা ধরিয়া পথের দিকে নিষ্পলক চাহিয়া রহিল।

এই পঙ্কজ,—সামান্য কথার আঁচও যাহার সয় না। পঙ্কজ, রঞ্জন নহে,—অমরেশও নহে। তাই তাহার স্বাতন্ত্র্য অন্যের কাছে বিসদৃশ হইলেও, নিজের যুক্তিতে সে বড়। সে স্বীকার করে না, জগতের কোনো সভ্যতা মানুষকে বড় করিয়াছে, বরং খর্ব করিয়াছে। নিয়মের সহস্র-পাক অহোরহ মানুষকে চোখ রাঙাইয়া শাসাইতেছে, প্রকৃতি যেন মার খাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছে। যে-সভ্যতা মানুষকে পংগু করিবার পরামর্শ দেয় তাহাকে আর যাহারাই স্বীকার করুক, পঙ্কজ কোনোদিনই স্বীকার করিবে না।

একদিন অবন্তিকার সহিত পঙ্কজ এই লইয়াই ঝগড়া করিয়াছিল।

অবন্তিকা এই সভ্যতারই ছাঁচে-ঢালাই-করা জীবন্ত একটি মেয়ে ছাড়া কেউ নয়,—সে চলে, ওজন-মাফিক পা ফেলিয়া, বলে, কমা-সেমিকোলন বজায় রাখিয়া,—পিসীর নির্দেশ, সমাজের ব্যবস্থা, রুচি ও অরুচির প্রতি দৃষ্টি—যাহার নাই স্বাতন্ত্র্য, আত্মবিশ্বাস: এমন সভ্য মেয়ে যে পুরুষের স্পর্শে আঁতকাইয়া ওঠে, যাহার সহিত নিভৃতে আলাপ করিলে মেয়েমহলে ভূমিকম্প হইবার সম্ভাবনা, সে করিবে পৃথিবীর কল্যাণ?

কল্যাণ উহারা করিতে জানে না,—আধুনিক-সভ্যতা উহাদের কোন কল্যাণই করিতে দিবে না।

ঐ জ্ঞানাঙ্কুর তাহার কি ক্ষতি করিতে পারে? অবন্তিকাকে লইয়া সে যদি কোনো কাহিনী রচনা করিয়াই থাকে,—করুক। কিন্তু ইহার জন্য তাহাকে দায়ি করিলে চলিবে কেন? সে জানে, তাহার সম্মুখের পৃথিবী মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে,—কোথাও এক ফোঁটা করুণা তাহার জন্য জাগিয়া নাই।—নির্মম পৃথিবী, অভিশপ্ত পৃথিবী! সে জানে তাহার মাকে: মাকে লইয়াই তাহার জীবন, মাকে লইয়াই তাহার পৃথিবী। অবন্তিকা সেখানে কতটুকু? পথচারি অগনিত নর-নারীর মধ্যে সে যদি উজ্জ্বল হইয়াই তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে থাকে, তবে সে নিজের আলোতেই জ্বলিবে—যেমন জ্বলে আকাশের বুকে শুকতারা লক্ষ তারার মাঝে। জ্ঞানাঙ্কুর ভুল করিয়াছে, ভুল বুঝিয়াছে,—এ ভুল তাহাকে একদিন সংশোধন করিতে হইবে, সে-ই তাহার ভুল শুধরাইয়া দিবে।

কিন্তু ইহারই নাম কি সংশোধন? যে-নাটক সে লিখিবে বলিয়া এতকাল প্রতীক্ষা করিয়াছে আজ তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র চোখের সামনে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠিল। ইহারাই তো তাহার নাটকের নায়ক নায়িকা,—কিন্তু যাহাকে লইয়া তাহার নাটক সে ইহার কোন্ অংশ অধিকার করিয়া থাকিবে? একটা আকস্মিক বিপ্লবই যদি তাহার নাটকে

ঘটাইতে না পারিল, তবে অনর্থক নাটক লিখিয়া কি হইবে? স্ট্রাগ্‌ল নাই কাহার জীবনে? কিন্তু উহাই তো নাটক নহে। অবন্তিকা বলিয়াছে লিখিয়া যাইতে, পরের কথা পরে হইবে। কিন্তু কি হইবে?—কি হইতে পারে? জ্ঞানাঙ্কুর আসিয়া পড়িয়াছে তাহার নাটকের মধ্যস্থলে,—দেখা যাইতেছে এই জ্ঞানাঙ্কুরকে দিয়াই নাটকের শেষ-অংক টানিতে হইবে।

সারারাত্রি ছটফট করিয়া পঙ্কজ অবশেষে নাটকের গল্প বানাইল। গল্প বানাইয়াই মনে পড়িল অবন্তিকার কথা। এই অবন্তিকাকে লইয়াই বা সে কি করিবে? নাটকের অনেকখানি অংশ সে জুড়িয়া বসিয়াছে। হয়, অবন্তিকাকে মধ্যপথে দাঁড় করাইয়া বলিতে হইবে, তুমি ফিরিয়া যাও, কিংবা নিজের হাতে তাহার গলা টিপিয়া তাহাকে নিঃশেষে মুক্তি দিতে হইবে। কিন্তু অবন্তিকাকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্যই কি সে এই নাটকের অবতারণা করিয়া বসিল? নাটকে যাহা ঘটে ঘটুক, তাহার জন্য নিজের এতখানি ব্যাকুলতাই বা কেনো?

পঙ্কজ আবার নূতন করিয়া চোখে-মুখে জল দিয়া আসিয়া বসিল। বারান্দার এককোনে তখন অস্তমিত চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। আর-একটু পরেই ভোর হইবে, রাস্তায় লোক-চলাচল সুরু হইবে, তাহাকেও কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ঘড়ির কাঁটার মত সবাই চলিয়াছে আপন-আপন পথে। আবার রাত্রি আসিবে, আবার সূর্য উঠিবে।

মনে পড়িল, তাহার দুখিনী মাকে। যে শুধু সহ্যই করিয়া গেল,—যে কেবল কাঁদিতেই আসিয়াছিল,—যাহার জীবনে সূর্যোদয় নাই, নাই ভবিষ্যৎ, নাই বর্তমান—কিন্তু যাহার জন্য এই নাটকের সৃষ্টি, সে এই নাটকের কোন্ অংশ গ্রহণ করিবে? পঙ্কজ উন্মাদের মত চিৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে-হাসি রাত্রির বুক চিরিয়া যেন তাহাকেই ব্যঙ্গ করিয়া দিগন্তে মিলাইয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু মিলির জীবনের গতি কি আজ এইখানেই স্তব্ধ হইয়া গেল? মিলি কি ফুরাইয়া গেল? আকাংখা, স্বপ্ন আর সম্ভাবনা দিয়া বোনা ভবিষ্যতের স্বর্ণসূত্র আজ কি এইভাবেই ছিঁড়িয়া গেল? মিলির চোখে জল আসে কিন্তু সে কাঁদিতে পারে না—কেনই বা কাঁদিবে? আজ দোষ কাহাকেই বা দিতে যাইবে? অদৃষ্ট যদি তাহাকে এতদূরেই নামাইয়াছে,—তবে নামিয়াই সে দেখিবে পৃথিবীর পাঁক কোথায়? আভিজাত্যের বড়াই করিয়া যাহারা ঘরে ও বাহিরে ভালছেলে সাজিয়া বেড়ায়, যাহারা লোভ দেখাইয়া পথে নামাইতে জানে—টানিয়া তুলিতে জানে না,—যাহারা মূর্তিমান অরুচিকর-অসংযম, মিলি তাহাদেরই উপর প্রতিশোধ লইবে। তাহাকে বাঁচিতে হইবে, নিজেকে এমন করিয়া ফুরাইতে দিলে চলিবে না। চাই স্বাস্থ্য, চাই যৌবন—সেই-যৌবন যা ছিলো দেবভোগ্যা উর্বশীর।

মিলি সেইদিনই বাসা বদল করিয়া বৌবাজারের একটা বাড়িতে উঠিয়া আসিল। এবং সেইদিনই সিনেমা-ডাইরেক্টর ললিত মিত্রের সংগে দেখা করিল।

ললিতবাবু বলিলেন, "আপনার ক্যামেরা-ফেস্ খুব চমৎকার! ভালভাবে খেলিয়ে নিতে পারলে আপনি নাম কোরে যাবেন।"

"বেশ খেলান, আমি খেলবার জন্তেই তো এসেছি।" বলিয়া মিলি অপরূপ-ভংগীতে হাসিল।

"Good. আপনার হাসিটি আরো চমৎকার।" ললিতবাবু যেন লাফাইয়া উঠিলেন।

মিলি হাসিয়া বলিল, এইটুকুতেই এতটা চঞ্চল হোলেন? আমার

দেহের সব অংশই সুন্দর—সংকোচ না কোরে বলুন, আমি দেখাতে পারি।"

ললিত ঘামিতে সুরু করিয়াছে।

"দাঁত দেখবেন?—দেখুন, কেমন সুন্দর দাঁত।" বলিয়া মিলি দাঁত বাহির করিয়া দেখাইল। দেখেছেন কখনো এমন দাঁত?"

ললিত সত্যই দেখে নাই,—দাঁতের কথা নহে, মিলির মত এরূপ মেয়ে—সিনেমা-লাইনে থাকিয়া অনেক মেয়েকেই সে দেখিয়াছে, অনেক মেয়ের সংশ্রবে আসিয়াছে, কিন্তু এ যেন তাহাদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাকে দাঁড় করাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কথা শুনিতে ইচ্ছা করে—ইহাকে লইয়া গৃহত্যাগ করা চলে, ইহাকে লইয়া মরিতেও বুঝি পারা যায়।

মিলি বলিল, "কি ভাবছেন?—দাঁতের কথা?"

"না,—কিন্তু আমার কাছে আপনাকে কে পাঠালে?"

"কে আবার পাঠাবে। সিনেমা-লাইনে যাবো ব'লে বেরোলাম, দরজায় দেখি আপনার নাম-খোদাইকরা ট্যাবলেট্। আপনাকে না-পেতাম অন্য কারো ভাগ্যে গিয়ে পড়তাম। আপনার কপাল ভাল।"

সত্যই ললিতের কপাল ভাল। মিলিকে পাইলে সে সিনেমা-জগতে একটা আলোড়ন সুরু করিবে। তাহার নূতন ছবির নায়িকা সম্বন্ধে একটা দুশ্চিন্তা ছিলো,—বাংলা দেশে সচরাচর পথে ঘাটে যে-মেয়ে মেলে, এ সে-মেয়ে নয়; খুব স্মার্ট বলিয়া যাহারা আসে, তাহারা আসলে কেহই স্মার্ট নয়। একটু দৌড়াইতে পারিলে বা সহিসের হাতে লাগাম দিয়া ঘোড়ায় চড়িতে পারিলে স্মার্ট হওয়া যায় না। তবে উহারাই বাংলাদেশের রাণী দুর্গাবতী।

ললিত বলিল, "দেখুন, আপনার 'হাইট্' বোধহয় একটু কম হবে।"

"তা হয়তো হবে, তবে অন্যদিকে পুষিয়ে দিতে পারবো।" বলিয়া

মিলি মধুর একটুখানি হাসিল। "যেমন আমার বুকের মাপ ছত্রিশ, কোমর চব্বিশ,—এ বাংলাদেশে আর কারো পাবেন না।"

ললিত মুখ ঘুরাইয়া হাসিয়া আসল কথা পাড়িল, "আপনাকে কি দিতে হবে?"

"টাকার কথা আপনার সঙ্গে নাই বা বললাম, আপনাদের মালিক কে? ফোন তো রয়েছে একটা খবর দিন না।"

মালিক একজন ভাটিয়া। খবর পাইয়া তিনি প্রায় ছুটিতে ছুটিতে আসিলেন। মিলিকে দেখিয়া তিনি কি করিবেন—বসিবেন, না দাঁড়াইয়া রহিবেন,—নমস্কার করিবেন, না সেলাম করিবেন,—কোথায় আসিয়াছেন, কেন আসিয়াছেন, সব ভুলিয়া গেলেন।

মিলি তাহার অবস্থা দেখিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অদ্ভুত এই হাসি,—ধারালো তলোয়ারের মত, যে-কোনো মুহূর্তে ঐ হাসি তোমাকে কাটিয়া দুখানা করিয়া ফেলিবে,—তুমি টেরও পাইবে না, কখন কিরূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছ!

ললিত ডাকিল, "করমচাঁদজি।"

করমচাঁদ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "তুমি দেখো ললিত, হামার কি আছে, ছবি ভাল হোয়, লেকিন পয়সা ভি দেয়—বন্দ্‌বস্ত করিয়ে লাও, ময় তো দেনেকে লিয়ে তৈরি হ্যায়।

মিলিই কথা বলিল, "Thats a good Idea. কিন্তু কি দেবেন আপনি?—কি দিতে পারেন?"

"সম্‌ঝো, দিতে হামি অনেক পারি, লেকিন লেনেকা তাগদ রহনা চাহি।"

"অর্থাৎ খেলিয়ে নিতে জানা চাই—কেমন, এই না?" মিলি হাসিয়া বলিল।

ললিত করমচাঁদকে ডাকিয়া কানে কানে কি বলিল, তারপর মিলিকে জানাইয়া দিল, আপনাকে মনোনীত করা হোলো।"

"আমাকে মনোনীত কোরেই আমার বিধাতাপুরুষ মর্তে পাঠিয়েছেন,—কিন্তু আসল কথাটি কি বলুন?"

"দেখুন, এ লাইনে আপনি নতুন—"

"এ কেয়া বাত্ বোলতা হ্যায় ললিত, রূপেয়া দেবে হামি,—নায়া পুরাণাকা বাত নেহি হ্যায়, এইসা মেয়েমানুষ তুমি কভি দেখেছো ললিত? সম্‌ঝো কিনা—একঠো হাসি নিকালা, যিস্‌কা দাম লাখো রূপেয়া।" একটু থামিয়া করমচাঁদ আবার বলিল, "আর দেখো ললিত, আগাড়ি ইন্‌কা 'স্টীল ফটো' এক ডজন লেনা চাহি—আর ঐ একঠো হাঁসি—"

ললিত হাসিয়া বলিল, "সাইলেণ্ট লেনেসে ঐসা স্যুইট্ হোগা নেহি।"

"ট্রাক্ লাগাও।" বলিয়া আত্মতৃপ্তিতে করমচাঁদ পকেট হইতে একটি বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল। "আর দেখো ললিত," ব্যস্ত হইয়া করমচাঁদ বলিল, "এইসা হাঁসি তুমহারা ছবিমে পাঁচ-দশঠো ঘুষানা চাহি।"

য়্যাসিস্টেণ্ট বসন্ত আসিয়া দরজার সম্মুখেই ঘামিতে সুরু করিল।

মিলি হাসিয়া বলিল, "ভয় কি,—আসুন।"

সকলে হো হো করিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বসন্ত বসিয়াছে, কিন্তু মিলি থামে নাই। সে ললিতের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে চান ললিতবাবু! যাদের মেরুদণ্ড আজো সোজা হোলো না তারা করবে দেশ উদ্ধার! তারপর বসন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার কত বয়স হয়েছে খোকা? বোধকরি, আমার চেয়ে বড়ই হবে। কিন্তু আপনাদের কি দুঃসাহস ললিতবাবু, এই দুধের ছেলেকে এনেছেন সিনেমা-লাইনে! ও যে শুকিয়ে শুকিয়েই

ম'রে যাবে! যে চোখ খুলে মেয়েদের সাম্‌নে দাঁড়াতেই জানে না,— তাকে দিয়ে করাবেন আপনারা কাজ? এর চেয়ে মুদিখানার দোকানে খাতা লিখলে ও আরো কিছুদিন বাঁচতো।"

হাসিতে হাসিতে করমচাঁদের প্রায় দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, ললিত জোরে হাসিতেও পারে না, না হাসিয়াও থাকিতে পারে না এইরূপ যখন অবস্থা তখন অকারণে একটা চাকরকে ধমক দিয়া ডাকিয়া বলিল, "বাবুলোককা 'য়াস্তে চা লে আও।"

মিলি হাসিয়া বলিল, "ললিতবাবুর সংযমরক্ষার কৌশল দেখে মুগ্ধ হোয়েছি।"

করমচাঁদ ইহার সবটুকু না বুঝিলেও, 'মুগ্ধ' কথার অর্থ বোঝে। মিলির কথা শুনিয়া সে মনে মনে দমিয়া গেল, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিল না। প্রকাশ্যে বলিল, "ললিতবাবুকা টাইম আভি ভাল যাতা হ্যায়। দেখো বসন্ত, কাম করো, কাম করো,—ঐসা টেবিল পর বদন ঘুসাকে রহনে হোয়, ঘর যাও। তোম আদ্‌মি হ্যায়, না কা?"

হঠাৎ করমচাঁদের গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়া গেল দেখিয়া মিলিও বিস্মিত হইল, কিন্তু করমচাঁদকে সে এক আঁচড়েই বুঝিয়া লইয়াছিল,— তাই সহাস্যে বলিল, "দেখিয়ে বাবুসাব, কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলি।"

করমচাঁদ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বলিয়ে।"

মিলি হাসিল,—মধুর সেই হাসি, যে-হাসি মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয়। করমচাঁদও ভুলিল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া গিয়া করমচাঁদ আগাইয়া আসিয়া মিলির হাত ধরিল, বলিল, "তুমি হামারা কাম করো, হামি তুমহারা কোঠি বনায় দেগা।"

ঠিক এইসময় আসিল আরো দুটি মেয়ে,—রেবা ও বেবী। যাহারা ইতিপূর্বেই মনোনীত হইয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া এবং সম্মুখে মিলিকে

দেখিয়া—যদিও মিলির সহিত তাহাদের কোনো পরিচয়ই নাই, কিন্তু ঐ অপরিচিতা যে এই ছবির নায়িকারূপেই নির্বাচিতা হইয়াছে ইহা বুঝিয়া লইতে তাহাদের কষ্ট হইল না। বেবী কিন্তু দমিয়া গেল, আজ মিলি এরূপভাবে না আসিয়া পড়িলে হয়তো সেই হইত এই ছবির নায়িকা। এবং সেই সম্ভাবনার আভাস পাইয়াই আজ সে বিশেষ উৎসাহ করিয়া আসিয়াছিল।

ললিত আগাইয়া আসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। বলিল, বসুন।

বেবীই কথা বলিল প্রথম, "আশা করি আপনার ফাইন্যাল সিলেক্সন এখনো হয়নি ?"

"না, এখনো হয়নি।"

করমচাঁদ হাসিয়া মিলির দিকে চাহিল। প্রত্যুত্তরে মিলি আব্দার ধরিল, চলুন না, আপনার স্টুডিওটা একবার দেখে আসি।

করমচাদ প্রমাদ গণিল। স্টুডিও বলিয়া তাহার স্বতন্ত্র কোনো আস্তানা নাই, পরের স্টুডিও ভাড়া লইয়া সে এ-পর্যন্ত ছবি তুলিয়া আসিয়াছে,—তাই প্রকাশ্যে বলিল, স্টুডিও তো আভি খোলা নেই আছে, —দারোয়ানভি চলা গিয়া।"

মিলি সহাস্যে বলিল, "স্টুডিও আছে তো ?"

মালিকের মুখের উপর এত বড় কথা বলিবার সাহস রাখে,—এ মেয়ে কে গো! বেবী ও রেবা তখন ইহাই ভাবিতেছিল।

ললিত রুক্ষস্বরে জবাব দিলো, "দেখুন, আপনি আপনার অধিকারের বাইরে যাচ্ছেন। তবু বলি, আমরা আড্ডা দেবার জন্যে এত বড় একটা অফিস ফেঁদে বসিনি।"

"এক্সকিউজ মি ললিতবাবু! কথাটা রূঢ় শোনালো বটে,—কিন্তু অনেক প্রডিউসার ঐভাবেই ছবি তুলে থাকেন কিনা।"

করমচাঁদ ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং মুখখানাকে যথাসম্ভব প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "তুমি ঠিক বলিয়েসে,—সম্‌ঝো কিনা, হামার কাম দোস্‌রা।"

স্টুডিও-প্রসঙ্গ সেইখানেই থামিয়া গেল বটে, কিন্তু বেবীর সংশয় গেলো না। বিশেষ করিয়া মিলির প্রতি করমচাঁদের পক্ষপাতিত্ব তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই একসময় ললিতের অতি সন্নিকটে গিয়া শুধু এই কথাই বলিল, "আমাদের প্রয়োজন যদি না থাকে বলুন, আমরা চ'লে যাই।"

ললিতও মৃদুস্বরে জানাইল, ব্যস্ত হবার দরকার কি,—ব'সো।

মিলির দ্রুত পতন সুরু হইয়াছে,—যাহা সে চাহিয়াছিল। কেন চাহিবে না? সে তো ভাল থাকিব বলিয়াই রঞ্জনকে বিবাহ করিবার অনুরোধ জানাইয়াছিল, কিন্তু সে তাহাকে বিবাহ করিল না, বরং বিবাহেতর পথের সন্ধান সেই প্রথম তাহাকে দেখাইয়া দিয়া গেল। ভীরু অমরেশও তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে পারিল না। কেহ যদি ভাল করিতে না-ই পারিল, তবে আজ অপরের উচ্চারিত মন্দকথাই বা সে শুনিবে কেন? বাঁচিবার জন্যই সে এ-পৃথিবীতে আসিয়াছে—বাঁচিয়াই দেখিবে। দেহের শুচিতা? বাঁচিবার প্রয়োজনে মানুষ তো অনেক কিছুই করিতেছে। ভাত রাঁধিয়া অপরের দাসিবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করাতেই কি নারীর মর্যাদা? অনশনে অর্ধাশনে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিতেই হইবে,—ইহাই কি স্ত্রীধর্ম? যাহারা খারাপ হইতে ভয় পায়, যাহারা দুঃখ সহিয়াও খারাপ হইতে জানে না,—তাহারা মৃত। যক্ষের মত তাহারা আপন

সতীত্বকে আগলাইবার জন্তই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—আগলাইয়াই চলিয়া যাইবে। মার খাইবে, ফোঁস করিবে না। এই অক্ষম-সংযমতাকেই আমাদের দেশ দৈহিক-সতীত্বের পাবলিসিটি দিয়া মৃতপ্রায় মেয়েদেরকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মিলি নামিবে বলিয়াই ধাপে-ধাপে নামিয়া চলিয়াছে! কিন্তু সে বলে, ইহা তাহার অবরোহণ: ধাপে-ধাপে উঠিয়া চলিয়াছে। সে তো কোন্‌দিন মরিয়া যাইত,—তিলে-তিলে, যৌবনের অপমৃত্যু তথা দেহের অপগতি,—ঐ ফুটপাথে, না হয় গঙ্গার ধারে। কেহ ডাকিয়াও বলিত না, আহা, দুটি খাইয়া যাও, আশ্রয় দিবার নৈতিক-সাহস কাহারও নাই।—তবে?

পাপ করিয়াছে ঐ রেবা,—যে তাহার স্বামীকে ফাঁকি দিয়া ব্যভিচার করিতেছে। জ্যোতিপ্রকাশ বলিয়াছিল, ঠিক এই কারণেই ঐ মেয়েটাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। জ্যোতিপ্রকাশ মিলির কো-এক্টর, এই ছবির নায়ক। কিন্তু বেশ ছেলে জ্যোতিপ্রকাশ। সৎ বলিয়াও অহংকার নাই, অসৎ হইতেও জানে না: সাহস করিয়া মদ খাইতেও বাধে না, মদ না হইলেও চলে: সে উচ্ছৃংখল হইতেও যেমন জানে, ফিরিয়া আসিতেও অতি সহজে পারে।

মিলি বলে, অদ্ভুত এই জ্যোতিপ্রকাশ। এই জ্যোতিপ্রকাশকে লইয়া মিলি মাতিয়া উঠিয়াছে,—জ্যোতিপ্রকাশও তাহার মদির-রাত্রিকে এক স্বপ্নময় আবেশের ভিতর দিয়া লইয়া চলিয়াছে।

স্টুডিওর কাজ শেষ করিয়া সেদিন সকাল-সকালই জ্যোতিপ্রকাশ মিলির ঘরে আসিল।

মিলি বলিল, "আজ তোমার জন্তে কি আনিয়ে রেখেছি দেখো।"

জ্যোতিপ্রকাশ দেখিল, একটি 'জনিওয়াকারে'র বোতল। সোৎসাহে বলিল, "তাহোলে আমাকেও তো এর প্রতিদান দিতে হয়। কি দিতে পারি,—আচ্ছা, কি দেবো বোলে তুমি মনে করো মিলি?"

একসংগে মিলির অনেককিছুই মনে হইল। ভাল একখানা শাড়ি, হীরার দুল, কানবালা কিংবা একটা আংটি—কিংবা—

কিন্তু সকল কিংবাকেই বিস্মিত করিয়া দিয়া জ্যোতিপ্রকাশ গম্ভীর-মুখে পকেট হইতে চিনাবাদাম বাহির করিয়া বলিল,—"কেমন চমৎকার হবে বলো দেখি ?"

মিলি হাসিতে হাসিতে পেটে খিল ধরাইয়া ফেলিল। বলিল, "এত হাসাতে পারো তুমি !"

"এতে হাসবার কি হোলো ?—চিনাবাদাম কি একটা যে-সে সামগ্রী ? মনে করো দেখি, জনিওয়াকারের পাশে চিনাবাদাম,—চীনে যদি ওর সত্যি জন্ম হোয়ে থাকে তবে তো ওর জন্ম সার্থক হোয়ে গেলো।"

"হঠাৎ তোমার চিনা-প্রীতি এত প্রবল হোলো দেখে আশংকিত হচ্ছি !"

"আশংকা করবার কিছু নেই, যখন তুমি আছো আমার সংগে, আর জনিওয়াকার আছে হাতের কাছে—এ-দুটো নিয়ে অনায়াসে উচ্ছন্নে যেতে পারবো।"

"তোমাকে উচ্ছন্নে দিতে পারে এমন মেয়ে আজো জন্মায়নি।"

একটা প্রচ্ছন্ন-ইংগিত ছিলো মিলির মনে। সেইটা হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ায় মিলি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জ্যোতিপ্রকাশ নিঃশব্দে গ্লাসের পর গ্লাস সেই তরল-বিষ উদরস্থ করিয়া চলিয়াছে। হঠাৎ মিলির হাসিতে সচকিত হইয়া বলিল, "তুমি হাসতে পারো, ভগবান তোমাকে হাসবার জন্যেই দুনিয়াতে পাঠিয়েছে—তোমারই হাসি দিয়ে তৈরি এই জনিওয়াকার,—দেখছো না, তোমারই হাসির মত এ টলটল করছে !" বলিয়া জ্যোতিপ্রকাশ তাহার গ্লাসটা উঁচু করিয়া ধরিল।

কিন্তু গ্লাস উঁচু করিয়া ধরিতেই তাহার আর-একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল, প্রবল হাসির বেগ সে আর সামলাইতে পারিল না,—গ্লাস লইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

এরূপ প্রায়ই হয়। অচেতন না হইলে তাহার আত্মতৃপ্তি হয় না। সে বলে জাগিয়াই রহিলাম তো মদ খাইলাম কি ?—সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির কোলে আত্মসমর্পণ : কেমন নিশ্চিন্ত হইয়া ভুলিতে পারিব, তুমি কে,—আমি কে : কোথায় আমি,—কেনো আমি !

ঘড়িতে তখন নটা বাজিয়াছে। বড় আয়নাটার সম্মুখে মিলি একবার থমকিয়া দাঁড়াইল,—নিজেকে অনেকক্ষণ বেশ করিয়া দেখিল, তারপর আপন মনেই উচ্চারণ করিল, বেশ আছি। একবার চিৎকার করিয়া হাসিতে ইচ্ছা করিল। জীবনের বিচিত্র-অধ্যায়ের স্মৃতি মনে করিয়াই তাহার হাসি পায় : রঞ্জনের কথা মনে করিয়া তাহার হাসি পায়, অমরেশকে মনে করিয়া হাসি পায়, ঐ করমচাঁদ, ললিতবাবু, জ্যোতিপ্রকাশ,—সবাই তাহাকে হাসাইয়াছে, আরও কতজনে হাসাইবে,—সেও হাসিবে।

জ্যোতিপ্রকাশ তখনো টেবিলটার উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে,—মদের গ্লাসটা উল্টাইয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে চিনাবাদামের খোসা, গ্লাসের মদ টেবিলটার গা বহিয়া চোঁয়াইয়া মেঝের কার্পেটের উপর পড়িতেছে। মিলি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই নারকীয়-দৃশ্য উপভোগ করিল : চমৎকার, উলংগ কদর্য ! ইচ্ছা হইল, ঐ জ্যোতিপ্রকাশের মাথাটা মিলি টেবিলের সংগে সজোরে ঠুকিয়া দেয়।

"দিদি !"

মিলি চমকাইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে, বসন্ত দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সলজ্জ-কুণ্ঠায় ঘামিয়া উঠিয়াছে। একটি ছোট্ট বাঁকা-হাসি মিলির অধর-প্রান্তে খেলিয়া গেল। বলিল, এসো, লজ্জা কি।

"না, আমি বসবো না,—ললিতবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।"

'বেশ তো, ললিতবাবুই না হয় পাঠালেন,—কিন্তু বসতে দোষ কি!' বলিয়া মিলি একটা প্রবল হাসির বেগকে দমন করিয়া বসন্তর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল।

'সর্বনাশ হোয়েছে দিদি!' বসন্ত বলিল। আজকের সেট্‌টা একেবারে মাটি।

'মাটি কি রকম?' মিলি বলিল।

'পাঁচশো ফিট ফিল্‌ম একেবারে আউট অফ্ ফোকাস! বলিতে বলিতে বসন্ত হাসিয়া পেটে খিল ধরাইয়া ফেলিল।

'কিন্তু তাতে তোমার এতখানি আনন্দ হোলো কেনো বসন্ত?'

'হাসবো না? কি মজা হোলো বলুন দেখি,—অত পরিশ্রম, অত আয়োজন সব পণ্ড!'

'তুমি কি এই খবর দেবার জন্যে এতরাত্রে আমার কাছে এসেছো?'

'ললিতবাবু বললেন, কাল সকাল থেকে স্টুডিওতে কাজ চলবে—সাতটার মধ্যে প্রস্তুত হোয়ে থাকবেন।'

'কিন্তু আর-একজন যিনি প্রস্তুত হবেন, তাঁকে তো দেখছো।' বলিয়া মিলি জ্যোতিপ্রকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। 'তোমার খাওয়া হোয়েছে বসন্ত?'

'না, আমি তো এতক্ষণ বাদে স্টুডিও থেকে আসছি।'

'তা হোলে এক কাজ করো,—আমিও খাইনি, দুজনে আজ একসংগে খাবো, কেমন?'

বসন্তর মুখ শুকাইল। বলিল, তা কেমন কোরে হবে দিদি! আমাকে বাড়ি যেতে হবে।

'বেশ তো, খেতে আর কতক্ষণ লাগবে। তুমি ব'সো। বলিয়া মিলি ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।'

জ্যোতিপ্রকাশ তখন বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে পার্শ্বপরিবর্তন করিল।—'ইউ শাট্-আপ্, তোমাকে কতবার না বলেছি—এবাড়িতে এসো না।'

বসন্ত প্রমাদ গণিল। সে জানিত, মাতালের অসাধ্য কিছু নাই,—উত্তেজিত হইয়া ও যদি তাহার গলা টিপিয়া ধরে? মনে করিতেও বসন্তর হৃৎকম্প হইল। শুষ্ককণ্ঠে বলিল, জ্যোতিপ্রকাশদা, আমি বসন্ত।

"বসন্ত?

কবে কোন্ বসন্ত উৎসবে—
অতি সঙ্গোপনে,
কয়েছিলে কানে কানে—
অতি সুমধুর স্বরে,
ডেকেছিলে মোর নাম ধরি—"

বসন্ত অতি বিব্রত হইয়া উঠিলঃ জ্যোতিপ্রকাশ দা!

"কার কণ্ঠস্বর!
কে—কে তুমি বালক?
সেই নীল-নলিন-নয়ন দুটি!
না-না-না, তুমি যাও, তুমি যাও,—
শুনিয়াছ মিথ্যা সমাচার।"

উত্তেজিত হইয়া জ্যোতিপ্রকাশ উঠিতে গিয়া সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

বসন্ত চিৎকার করিয়া ডাকিল, মিলি দি!

"কি হয়েছে বসন্ত?"

"আমার বড় ভয় করছে মিলি দি, আমি বাড়ি যাই।"

'তুমি মাতালকে ভয় করো!' বলিয়া মিলি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"না, সত্যি আমার এসব ভাল লাগছে না।"

"কেনো বলো দেখি,—আমি রয়েছি কাছে তবু ভাল লাগছে না ?"

"আপনাকে আমার সত্যি ভাল লাগে, কিন্তু—"

"কিন্তু ঐ মাতালটাকে ভাল লাগছে না,—নয় ? আর আমি যদি মদ খেয়ে মাতাল হই ?"

এইবারে বসন্ত হাসিয়া ফেলিল। বলিল, ধ্যেৎ, আপনি মদ খেতে যাবেন কেনো !

"কেনো'র কথা নয়, কিন্তু আমিও যে খাই বসন্ত।"

'খুব অন্যায়, আপনার খুব অন্যায়।' কিন্তু ইহার বেশী বসন্ত আর কিছু বলিতে পারিল না,—ম্লানমুখে চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল।

'অন্যায় তো কতরকমেই করছি বসন্ত ! আমার কি ফিল্‌ম-লাইনেই আসা উচিত হয়েছে ?'

"খুব উচিত হয়েছে মিলি দি। আপনারা না এলে এতবড় একটা কালচারই বৃথা। জগতে খেঁদি-বুঁচির অভাব নেই,—তারা থাকুক ঘরকন্না নিয়ে। কিন্তু আপনার মত সুন্দরী—"

"ঘরকে বিষিয়ে তুলুক,—নয় বসন্ত ? জানতাম, তুমি কথা বলতে জানো না,—কিন্তু এখন দেখছি, সুযোগ এবং সুবিধা পেলে তুমি সবই করতে পারো।—তুমি কোনোদিন মদ খেয়েছো বসন্ত ?"

"না।"

"খেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে না ?"

"তা করে, কিন্তু ভয় করে।"

"ওটা কিছু নয়,—অনভ্যাসের ভয়। অভ্যেস কোরে নাও, ভয় কেটে যাবে।"

"না, ছিঃ !"

"ছি কেনো, আমি যে খাই।—খাবে একটু? আমি দোবো হাতে কোরে?"

"না, আমি বাড়ি যাবো।"

"যদি যেতে না দিই?" বলিয়া মিলি বসন্তর গলা জড়াইয়া ধরিল।

বসন্ত কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে ছেড়ে দিন দিদি, আমি বাড়ি যাই।

"বেশ, যাও।" বলিয়া মিলি রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু একটু পরেই মিলি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বসন্ত ঠিক একই ভাবে বসিয়া আছে। বলিল, কই গেলে না?

"আপনি রাগ করলেন কেন?"

"আমি রাগ করলে তোমার কি বসন্ত! কাজ ফুরুলে পরে আমিই বা কোথায় থাকবো আর তুমিই বা কোথায় থাকবে।"

বসন্ত কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'আপনি ওকথা কেন বলছেন,—যদি সে-রকম দুর্দিন কোনদিন আসেই, দেখবেন বসন্তও এখানে থাকবে না।

"কেনো, তুমি কোথায় যাবে বসন্ত?"

'আপনি জানেন না,—আপনাকে আমি—'

বসন্ত আর বলিতে পারিল না, টেবিলটার ওপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

মিলি মুখ টিপিয়া হাসিল। তারপর অতি মিষ্টি করিয়া বলিল, ছি, উঠে ব'সো,—আমি খাবার নিয়ে আসি।

খাবারের থালা টেবিলের উপর রাখিয়া মিলি যখন তাহার পাশে বসিল, বসন্ত আবার-একবার কাঁপিয়া উঠিল।

"খেতে পারবে,—না, খাইয়ে দেবো?"

বসন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, বলিল, কি যে বলেন আপনি!—কিন্তু আপনার খাবার কই—?

"কেনো, আমি না খেলে বুঝি খাবে না ?—আচ্ছা, আমিও খাচ্ছি তোমার সংগে।"

ইহার পর বসন্ত আর কিছু বলিতে না পারিয়া নিঃশব্দে খাইয়া চলিল। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর বসন্ত ইতঃস্তত করিয়া বলিল, কই, আর যে কি দেবেন বলেছিলেন—

"কি বলেছিলাম বলো তো ?"

'ঐ যে বললেন, আপনি হাতে কোরে দেবেন—'

'কি, মদ ?—থাক, ও আর তোমার খেয়ে কাজ নেই।"

"আপনি রাগ কোরে বলছেন।"

"না বসন্ত, আমি রাগ করিনি।"

"কিন্তু আমি খাবোই। না দিলে বুঝবো, আপনার রাগ এখনো পড়েনি।"

মিলি একবার বসন্তর মুখের দিকে চাহিল, তারপর ফিক করিয়া হাসিয়া বলিল, দুষ্টু ছেলে! ছোট্ট একটি পেগ বসন্তর মুখে ঢালিয়া দিয়া মিলি আর-একবার হাসিল। বলিল, নাও এবার সব খাবারটুকু খেয়ে নাও।

মুহূর্তমধ্যে বসন্ত যেন নূতন মানুষ হইয়া উঠিল। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল, সমস্তই যেন বদলাইয়া গিয়াছে,—এক স্বপ্নময়-জগতে নূতন মানুষরূপে এই তার প্রথম প্রবেশ! বসন্ত সমস্তই ভুলিয়া গেল: সে কোথায় আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে! শুধু চাহিয়া দেখিল, এজগতে একমাত্র মিলি ও সে রহিয়াছে—হাঁ, তাহার মিলি দি ও সে।

"মিলি দি!"

"আচ্ছা, তুমি আমাকে মিলি দি বলো কেনো ?"

"তবে কি বলবো ?"

"কেনো, আমার নাম নেই নাকি ?"

"ছি, লজ্জা করে।"

"তোমার এই লজ্জা কবে যাবে বলতে পারো বসন্ত! দিদি ব'লে ডাকলে আর কোনোদিন—"

তারপর সুর নামাইয়া বসন্তর গালে টোকা দিয়া বলিল, ছি, 'দিদি' বলে কখনো।

'সত্যি, চমৎকার লাগছে আজ তোমাকে।' বসন্ত তাহার মুগ্ধ-চোখ মেলিয়া দিয়াছে।

বসন্তর মুখখানা মিলি তাহার আরো কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, খুব ভাল কোরে দেখো বসন্ত,—যা কোনদিন তোমার সাহস হয়নি। আজ তোমার বাঁধ ভেঙে গিয়েছে,—যত কথা আছে বলো। কেমন লাগছে আজ বসন্ত? মনে হচ্ছে না, জীবনটা আজ ধন্য হোয়ে গেলো?

"হাঁ, আজ যেন আমি হাতে স্বর্গ পেলাম। ধন্য—ধন্য করেছো তুমি আমাকে।" বলিতে বলিতে বসন্ত মিলির হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিল।

"আঃ, দেখছো না, একজন মাটিতে প'ড়ে আছে।"

বসন্ত সভয়ে জ্যোতিপ্রকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, এখুনি জেগে উঠবে বুঝি?

"যদি জাগে?"

তা সত্য, মাতালটা যদি জাগিয়া ওঠে। মনে করিয়া বসন্তর মুখ বিবর্ণ হইল।

মিলি জোরে হাসিয়া উঠিল: আবার ভয়?

"না, ভয় নয়,—তবে জাগতেও তো পারে।"

"না, আজ রাত্রে ও আর জাগবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হও বসন্ত। অমনি কোরেই ওর রাত্রি কাটে। ঠিক অমনি কোরেই মাটিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে, প্রতি-রাত্রিকে ও অতিক্রম কোরে আসছে।"

"একটা কথা আমার বড় জানতে ইচ্ছে করছে—"

"এরূপ ক্ষেত্রে অনেকের অনেক কৌতূহলই হওয়া স্বাভাবিক বসন্ত। তোমার প্রশ্নটা তো এই, জ্যোতিপ্রকাশবাবুর সংগে আমার কি সম্পর্ক। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এতে তোমারই বা এতটা কৌতূহল কিসের ?"

বসন্ত বিমর্ষ হইয়া চুপ করিল। অনেকক্ষণ কেহ কিছু বলিল না, তারপর মিলি বলিল, রাগ করলে ?

"না।"

মিলি হাসিয়া আর একটি পেগ ঢালিয়া বসন্তর হাতে দিল।

বসন্ত বলিল, তারপর ?

"তারপর, খাও। খেলে আর দুঃখ থাকবে না।"

বসন্ত হাসিয়া সেই পেগও শেষ করিল।

'তারপর ?' মিলি কটাক্ষ করিয়া বলিল।

"তারপর ?

অনন্ত রাত্রির কোলে মোরা দুটি প্রাণী
রহিব জাগিয়া—"

"Good. তোমাকে নিয়েই আজ রাত জাগবো—" বলিয়া মিলি আর-এক পেগ প্রস্তুত করিল।

জ্যোতিপ্রকাশের যখন ঘুম ভাঙিল, দেখিল, মিলি এ-বাড়ির কোথাও নাই। এঘর-ওঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া কোথাও তাহার বাসের চিহ্ন পর্যন্ত পাইল না। এক রাত্রির মধ্যে সমস্তই যেন ভোজ-বাজীর মত উড়িয়া গেলো! শূন্য-বাড়িতে সেই কেবল রাত্রি জাগিয়াছে! বাড়িওয়ালাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও তাহার লজ্জা

করিল। কিন্তু এইভাবে বসিয়া থাকিয়াই বা সে কি করিবে? অবশ্য মিলির জন্য তাহার কোনোরূপ দুশ্চিন্তা নাই। ছবির নায়ক সে,—অভিনয় করিয়াই তাহার ছুটি, দ্যাট্স অল্। ইহার বেশী সে মিলির কাছে প্রত্যাশাও করে না, প্রার্থনাও তাহার নাই। সে মদ খায়, ভাল লাগে বলিয়া খায়। মিলিকেও ভাল লাগিত: রাত্রির নেশার মত অপরিহার্য সংগী সে। আজ মিলি নাই,—বাড়ি খালি করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ব্যস এই পর্যন্ত,—ইহার মধ্যে তাহার করিবারই বা কি থাকিতে পারে?—বলিবারই বা কি আছে?—কিছু না।

কিন্তু 'কিছু না' বলিয়াও সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। স্টুডিওতে খোঁজ লইতে আসিয়া দেখিল, সেখানেও কি-একটা গোলমাল চলিয়াছে। ললিত গর্জন করিয়া আগাইয়া আসিল, বলিল, "এতক্ষণে আপনাদের সময় হোলো বুঝি?—মিলি কোথায়?"

"মিলি! কেনো, আপনারা জানেন না? আমার তো ধারণা ছিলো—"

"আপনার ধারণার কথা হচ্ছে না,—সে ইডিয়টটা গেলো কোথায়?"

"কোন্ ইডিয়টের কথা বলছেন?"

"জ্যোতিপ্রকাশবাবু, আপনি কি আমার সংগে তামাসা করছেন?"

"তামাসা!—আপনার সংগে? I am not a so idiot—"

ললিত যেন মারিতে আসিল: "তখনই বলেছিলাম করমচাঁদবাবুকে,—এই সব মাতাল দিয়ে আমার কাজ চলবে না।"

"খুব সংযত হোয়ে কথা বলুন ললিতবাবু, আপনার কাজ চলবে, কি চলবে না—সে দেখবে কোম্পানী, আপনি নন। আপনার অধিকার যতটুকু—"

"অধিকার! How do you dare to insult me!"

"মান অপমান কি শুধু একা আপনারই আছে? তাছাড়া মদ যারা খায়, তারা কোনো দিন না কোনো দিন মাতাল হয়ই,—আপনি হন না?"

করমচাঁদবাবু, করমচাঁদবাবু! বলিয়া ললিত চিৎকার করিতে লাগিল।

করমচাঁদ ছুটিয়া আসিল। বলিল, "কি আবার হোলো তোমার? তোমার চিৎকারে তো—সমঝো কিনা, আমার মাথা ধরিয়ে গেলো! এই যে জ্যোতিপ্রকাশ, তুমি কি কোরো বলো তো! এতো বেলা হোলো, কুছু কাম ভি আগালো না! মিলি কোথায়?"

"সেই কথাই তো বলছিলাম জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে, তা উনি তো মারতে এলেন।" ললিত আগাইয়া আসিয়া বলিল।

"তোমার বোসন্ত কোন্ কাম করলো?" করমচাঁদ বিদ্রূপের সহিত জিজ্ঞাসা করিল।

জ্যোতিপ্রকাশ সবিস্ময়ে বলিল, "আপনাদের কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,—কোনো কি 'য়্যারেঞ্জমেণ্ট' ছিলো?"

করমচাঁদ দাঁত বাহির করিয়া হাসিল। বলিল, "বোসন্ত তোমার পাশ যায়নি?"

"কই, না।"

"দেখো ললিত, তোমার. বোসন্তকা কাম দেখো। আমি বুঝিয়েছি,—মিলি এসা কাম কভি করে? আভি গাড়ি ভেজো মিলিকা পাশ।"

"মিলি কোথায়? মিলি তো বাড়িতে নেই।" জ্যোতিপ্রকাশ বলিল।

করমচাঁদ 'হাঁ' করিয়া রহিল। ললিত জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় গেলো?

"সে খবর আমি কি কোরে জানবো স্যার?"

ললিত চিৎকার করিয়া উঠিল: তুমি জানো না?

"আজ্ঞে না।"

"এই কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে না কি?"

"বিশ্বাস করবেন না।"

ললিতের আর কথা যোগাইল না। বলিল, "কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?"

"ওখানেই ছিলাম স্যার। ঘুম ভেঙে দেখি, কেউ কোথাও নাই।" সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জ্যোতিপ্রকাশ বলিল, "সব ভোজবাজী স্যার!"

ললিত উন্মাদের মত পায়চারি করিতে লাগিল।

করমচাঁদ বলিল, "বোসন্ত ভি পালিয়েছে—"

ললিত চিৎকার করিয়া বলিল, "কেস ফাইল করুন করমচাঁদবাবু! কি কোরে ড্যামেজ আদায় করতে হয় আমি দেখিযে দিচ্ছি।"

"আরে কা দেখলাওগে ললিত, আভি উন্‌লোক জো দেখ্‌লাকে চলা গয়া, উহি হজম কর। স্টোরি ঘুমা লেও,—মিলিকো মার্‌না হোয় মারো, ইলোপ করনে হোয় কর,—যেয়সা তুমহারা খুসী। লেকিন মিলিকা ছবি হামারা চাহি।"

"তা কি কোরে হবে?" ললিত বলিল।

"নেই হোয়, কাম ছোড় দেও।" করমচাঁদ দাঁত বাহির করিয়া খিঁচাইয়া উঠিল।

অবশেষে ছবির গল্প সেইরূপই বানানো হইল। ছবির নায়িকা মঞ্জুলিকা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কাহার সহিত পলায়ন করিল, তাহার পর হইতে নায়ক হর্ষপ্রসাদের হর্ষ আর রহিল না: এই ট্রাজেডি-অংশ জুড়িয়া দিয়া নূতন নায়িকার অবতারণা করিয়া অপূর্ব এক খিচুড়ি প্রস্তুত হইল। কিন্তু ছবি যাহাই হোক্, ললিতের জ্বালা কমিল না।

মিলিকে লইয়া সে ছবির-রাজ্যে একদিন যুগান্তর আনিতে পারিবে, এই স্বপ্নই ছিলো তাহার প্রবল। সেই-স্বপ্নকে দুই পায়ে মাড়াইয়া ঐ রাস্কেল বসন্তটা মিলিকে লইয়া কোথায় চলিয়া গেলো !

রেবা আসিয়া বলিল, "তা যাই বলুন ললিতবাবু, মিলিদির রুচি আছে।"

ললিত গম্ভীর হইয়া বলিল, "হুঁ।"

"কিন্তু বসন্তবাবুর পেটে পেটে এতো !" বলিয়া রেবা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"কেনো, বসন্তর ওপর তোমারও একটু-আধটু ফ্যান্সি ছিলো না কি ?"

"থাকাই তো স্বাভাবিক ললিতবাবু! আপনার বয়স হয়েছে ব'লে দুঃখ করবেন না। তবে সকলের সব 'কোয়ালিফিকেসন' থাকে না, বসন্তর পয়সা নেই বটে কিন্তু রূপ আর যৌবন আছে—যা আপনাদের এখানে এক জ্যোতিপ্রকাশ ছাড়া আর কারুরই নেই। তবে জ্যোতিপ্রকাশবাবু বড্ড বেশী ভাল্‌গার : আমাদের গা ঘিন্ ঘিন্ করে।"

রেবা সত্যই বলিয়াছে, বসন্তর রূপ যৌবন দুইই আছে। তাই বলিয়া বসন্তকে মিলির ভাল লাগিবার কথা নয়, কিন্তু ভাল যখন সে কাহাকেও বাসিতে পাইল না,—সকলেই যখন তাহাকে প্রতারণা করিল, এবং ভাল থাকিবার পথও যখন তাহারা দল বাঁধিয়া বন্ধ করিয়া দিলো, তখন সেই বা কাহাকেও ভাল থাকিতে দিবে কেন ? নিজে নরকে নামিয়া ঐ সব নাবালক-নির্দোষ-রক্তে অধঃপাতের বিষ সংক্রামিত করিয়া যাইবে। ইহাতেই তাহার উল্লাস, ইহাই তাহার বর্তমান জীবনের ব্রত। তাই সে সকলের চোখে ধূলি দিয়া বসন্তকে সরাইয়া লইয়াছে। কাচপোকা যেমন আর্সুলাকে টানিয়া লইয়া চলে, মিলিও তেমনি বসন্তকে ধাপে-ধাপে নামাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তারপর ?

তারপরের কথা তাহারাই লিখিয়া যাইবে। সম্মুখে আছে অনন্ত রাত্রি, আর আছে তাহাদের দীর্ঘ পরমায়ু। কে কোথায় কাহাকে লইয়া মরিল কিংবা বাঁচিল তাহার ইতিহাস আমরা নাই বা লিখিলাম। তাহাদের কথা তাহারাই রাখিয়া যাইবে সর্বংসহা ধরিত্রীর বুকে। সুতরাং মিলির জীবন-কাহিনী এইখানেই শেষ করিলাম।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে পঙ্কজ নাটকের দুটি অংক লিখিয়া অবন্তিকাকে পাঠাইয়া দিয়াছে,—নিজে আজপর্যন্ত দেখা করে নাই। নাটকের শেষ অংক কিভাবে সমাপ্ত হইবে, পঙ্কজ এই লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানাঙ্কুরের সেদিনের প্রচ্ছন্ন-ইংগিত পঙ্কজ ভোলে নাই। আর ভোলে নাই বলিয়াই আগের মত যখন-তখন অবন্তিকার সম্মুখীন হইতে পারিতেছে না। পঙ্কজ এই কয়দিনে বৎসরের চিন্তা করিয়াছে। জানি না, অবন্তিকা তাহাকে লইয়া কি স্বপ্ন গড়িয়াছে এবং জ্ঞানাঙ্কুর ইংগিতে যাহা বলিতে চাহিয়াছে তাহা সত্য হইলে তাহাকেই সাবধান হইতে হইবে—প্রয়োজন হইলে অবন্তিকাকেই সে বলিয়া আসিবে, মরীচিকার পিছনে ছুটিও না।

কিন্তু জ্ঞানাঙ্কুরের অনুমান যদি মিথ্যা হয়? এবং সে-সম্ভাবনাই যদিও প্রবল, তখন যে লজ্জায় সে আর মুখ দেখাইতে পারিবে না। তখন তাহারই দুর্বলতা অতি কদর্য হইয়া সকলের মুখে-মুখে ছড়াইয়া পড়িবে।

কলেজ হইতে ফিরিয়া পঙ্কজ দেখিল, জ্ঞানাঙ্কুর তাহারই ঘরে বসিয়া

আছে। একটু আশ্চর্যও হইল, কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিল না, বরং গম্ভীর হইয়াই বলিল, "কি খবর জ্ঞানাঙ্কুরদা?"

"খবর আর কি—এলাম, এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা কোরে যাই। ভায়ার তো আজকাল আর দেখা পাবার জো নেই। আগে-আগে যেতে, তাও দেখাশোনা হোতো।—আমার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই, হাত মুখ ধোও—হাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলেছি,—আচ্ছা, তুমি আগে ঠাণ্ডা হও।"

পঙ্কজ হাত-মুখ ধুইয়া ভাল হইয়া বসিল, এবং চাকরকে চা আনিতে বলিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত খবরই জানিয়া লইল।

জ্ঞানাঙ্কুর বলিল, "যাই বলো ভায়া, অবন্তিকার এরকম 'ডুব্লিসিটি' করা মোটেই ভাল হয়নি। তবে কি জানো পঙ্কজ, বড় ঘরের বড় কথা।"

"সেই ছেলেটিকে আপনি দেখেছেন কোনোদিন?" পঙ্কজ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"দেখেছি মানে? He is a rougue,—রেস খেলে, মদ খায় কিনা জানা নেই—"

বাধা দিয়া পঙ্কজ বলিল, "সে ও-বাড়ি থেকে গেলো কেন?"

"সঠিক সংবাদ আমি জানি না, তবে শুনেছি নাকি সে আর-একটি মেয়ের সংগে—"

"থাক্, আর না বললেও চলবে।"

"আমাকে প্রায়ই বলতো অবন্তিকা, কাকা, একবার পঙ্কজবাবুর খবর নেবেন? দরদ দেখে রাগও হোতো,—আবার ভাবতাম, ভুল তো মানুষেই করে—আর ওরই বা দোষ কি, রাতদিন একটা পুরুষমানুষ কানের কাছে গুন্ গুন্ করলে—"

"আচ্ছা, জ্ঞানাঙ্কুরদা! আপনি ওখানে কি সম্পর্কে আছেন?"

"সম্পর্ক একটা আছে বই কি,—তবে আমার থাকাটা আর উচিত হচ্ছে না, কিন্তু কিই বা করবো, একটা জায়গা তো চাই।"

"জায়গা যদি নাও পান, ওখানে আর থাকবেন না।"

"কেনো, কিছু বলেছে নাকি ওরা?" উদ্‌গ্রীব হইয়া জ্ঞানাঙ্কুর পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিল।

"না, ওরা কিছু বলেনি।"

"তবু ভাল।" বলিয়া জ্ঞানাঙ্কুর যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল।

পঙ্কজ একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জ্ঞানাঙ্কুরকে দেখিয়া লইল। সত্য-মিথ্যা লইয়া এখানে প্রশ্ন নয়, জ্ঞানাঙ্কুরের কি স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত ইহাই তাহাকে সন্দিহান করিয়া তুলিল।

সেইদিন অপরাহ্ণেই পঙ্কজ অবন্তিকার সহিত দেখা করিল। বলিল, "সংবাদ সংগ্রহার্থে এসেছি।"

অবন্তিকা হাসিয়া উত্তর দিল, অধীনা সর্বদাই প্রস্তুত।

দুর্জনে রটনা করেছে, কোন্ এক মালাকর ফুল যোগাবার আশায় তার রাণীর কাছে নিত্য যাওয়া-আসা করতো। হতভাগা তাড়া খেয়ে ফিরে গেলো, ফুল-নিবেদনই সার হলো।

"তাড়া খেলো কেনো?"

"সে তার ভাগ্য।"

"সেই হতভাগ্যের তারা নাম বলেনি?"

"নাম জানবার কৌতূহল হয়নি।"

"তবে আজই বা এত আগ্রহ কেনো?

পঙ্কজ বেশ খানিকটা দমিয়া গেলো, কিন্তু কথা কহিয়া হটিবার পাত্র সে নয়, তাই বলিল, "আপনিই না হয় বলুন।"

"শুধু নাম ? আর কিছুই কি জানতে চান না ?"

"জানাবার সৎসাহস যদি আপনার থাকে—বলুন, শুনে যাই।"

অবন্তিকা হাসিয়া বলিল, "সে-সাহস অবশ্যই আছে, আপনি কি করবেন তাই বলুন ?"

পঙ্কজও হাসিয়া উত্তর দিলো, "আমি ম্লানমুখে ফিরে যাবো না এইটুকু বলতে পারি।"

"ঠিক তো ?"

"নিশ্চয়। অতটুকু বুকের বল আমার আছে।"

"শুনে আশ্বস্ত হলাম। ভদ্রলোকের নাম রঞ্জনবাবু।"

পঙ্কজ চমকাইয়া উঠিল।

অবন্তিকা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি চেনেন নাকি ?"

পঙ্কজ নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না। কিন্তু তিনি এখন গেলেন কোথায় ? আর কেনোই বা আসা-যাওয়া বন্ধ করলেন ?"

"আপনি দেখছি পুলিশের জেরা করতে সুরু করলেন ! রঞ্জনবাবু আমাদের প্রতিবেশী,—আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড।"

"ও, বুঝতে পেরেছি।"

"কি বুঝেছেন ?" অবন্তিকা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"থাক্, আর না বললেও চলবে। বাকিটা অনুমান কোরে নিতে পারবো।"

অবন্তিকা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "কিন্তু সকল অনুমান সকল সময়ে সত্য হবে এই বা আপনাকে কে বললে ? রঞ্জনবাবু সম্বন্ধে আপনি যার কাছে যত কথাই শুনে থাকুন, তা যে কত বড় মিথ্যে সেটা প্রমাণ করবার আমার গরজ নেই। আর এও জানবেন, ঐ রকম সত্য-মিথ্যা অনেককথাই আপনার সম্বন্ধেও উঠেছে,—আশা করি, এর সদুত্তর আপনার কাছে পাবো।"

পঙ্কজ একমুহূর্ত কি ভাবিল, তারপর বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন, —আমি খুব উত্তেজিত হোয়েই—"

"খুবই স্বাভাবিক পঙ্কজবাবু।" বলিয়া অবন্তিকা মুখ টিপিয়া হাসিল। তারপর চিৎকার করিয়া ডাকিল, "জ্ঞানাঙ্কুরবাবু!"

এই অপ্রত্যাশিত রূঢ়-আহ্বানে জ্ঞানাঙ্কুর বিস্মিত হইয়াই ছুটিয়া আসিল। অবন্তিকা কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া বলিল, "কাল থেকে আপনি অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা করবেন।"

জ্ঞানাঙ্কুর কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু অবন্তিকা তাহাকে একটি কথাও বলিতে দিল না, বরং বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিল, কাল যেন তাহাকে দ্বিতীয়বার আর না বলিতে হয়।

জ্ঞানাঙ্কুর একবার পঙ্কজের দিকে কটমট করিয়া চাহিল, তারপর অতি ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া গেল।

পঙ্কজ বলিল, "আপনার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।"

"আপনি জানেন না পঙ্কজবাবু, ঐ লোকটার অনেক অত্যাচার আমি পিসীমার মুখ চেয়ে সহ্য করেছি। স-কন্যা একটা রাজত্ব পাবার দুরভিসন্ধি নিয়ে ও এই-বাড়িতে আসে—সবই জানি পঙ্কজবাবু, ওর লোলুপদৃষ্টি আমার চোখ এড়ায়নি।"

"আপনি বলেন কি! ঐ পঞ্চাশ বছরের বুড়ো—"

সেকথা কানে না তুলিয়া অবন্তিকা চিৎকার করিয়া ডাকিল, পিসীমা!

মহামায়া ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "কি হয়েছে অবন্তি?"

"রঞ্জনবাবুর সংগে এ-বাড়ির কতটুকু সম্বন্ধ ছিলো, তুমি তো জানো পিসীমা!"

"কেনো, কি হয়েছে?"

"জ্ঞানাঙ্কুরবাবু কি-সব বা-তা লাগিয়েছেন পঙ্কজবাবুর কাছে। আমি অনেক সহ্য করেছি পিসীমা,—সময় থাকতে জানিয়ে রাখা ভাল, আমি জ্ঞানাঙ্কুরবাবুকে কাল এবাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছি।"

"বেশ করেছো মা, নিজের মর্যাদা রাখতে এমনি কঠিন হোতে হবে বই কি। আত্মীয় না হোলে আমি ওকে দারোয়ান দিয়ে বের কোরে দিতাম।" তারপর পঙ্কজের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি কখনো রঞ্জনকে গ্যাখো, তুমি তোমার ভুল বুঝতে পারবে। নিজেকে সে রেখেছে পরিপাটি কোরে সাজিয়ে,—কি মনে, কি বাইরে: আটপৌরে-সমাজেও অচল। অবন্তিকাকে সত্যিই ওর ভাল লেগেছিলো—পাত্র হিসেবেও সে রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ, তবু সে অবন্তিকাকে খুসী করতে পারলে না। বিদায় যেদিন নিলে, হাসিমুখেই নিলে,—কারুর মনে কোনো ক্ষোভ রইলো না।"

"আমার অন্যায় সন্দেহের জন্যে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।" বলিয়া পঙ্কজ একবার অবন্তিকার দিকে আর একবার মহামায়ার দিকে চাহিল।

মহামায়া হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা বোসো—আমি চা নিয়ে আসি।"

মহামায়া চলিয়া গেলে অবন্তিকা মুখ তুলিয়া পঙ্কজের দিকে চাহিল। বলিল, "দেখলেন, আমার পিসীমা কত বড়? এমন পিসীমা যে-ঘরের কর্ত্রী, সে-ঘরের মেয়েরা কখনো অসভ্য হয় না জানবেন।"

"আচ্ছা, আপনিই বা এতটা চটে গেলেন কেনো বলুন তো?" পঙ্কজ বলিল।

"এ-অবস্থায় আপনি কি আমাকে হাসতে বলেন?"

"যা মিথ্যা, তাকে হাসি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়াই তো রীতি।"

"কিন্তু সকলের প্রকৃতি তো সমান নয়।"

"হাঁ, তা নয়,—আর তা নয় ব'লেই রঞ্জনবাবু বুদ্ধিমানের মত পলায়ন করলেন।"

অবন্তিকা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তারপর বলিল, কিন্তু সেজন্যে আপনারই বা এতখানি অনুতাপ কেনো? ইচ্ছে করলে আপনিও তো পালাতে পারেন। আপনাকে আটকে রাখা হয়েছে,—এ মিথ্যা সন্দেহই বা আপনি কোন্ সাহসে করেন?"

"দেখছি, আজ আপনার সংগে কথা বলতে হোলে নিজেকে অনেকখানি সাবধানে রাখতে হবে।"

"কেনো বলুন তো?"

পিঠে ঘা-কতক পড়তেও তো পারে; মেজাজ এখন সপ্তমে চ'ড়ে ব'সে আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় না-নামা পর্যন্ত কিছু বিশ্বাস নাই। বলিয়া পঙ্কজ হাসিল।

অবন্তিকাও হাসিয়া উত্তর দিল, "কিন্তু রঞ্জনবাবুর ব্যাপার নিয়ে আপনারই বা এতখানি কৌতূহল কিসের? জ্ঞানাঙ্কুরবাবুর কথা মিথ্যা হোক, সত্য হোক আপনার তাতে কি যায় আসে?"

"কিছু না, এখন যত মনে করছি, ততো হাসি পাচ্ছে।"

"এখন হয়তো পাচ্ছে, কিন্তু এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পায়নি।"

"তা হয়তো পায়নি, কিন্তু তাই বোলে এর অন্য কোনো অর্থও নেই।"

"বিশ্বাস করা কঠিন।" অবন্তিকার মুখে প্রচ্ছন্ন-হাসি।

"তোরা কি এখনো ছুটিতে ব'সে ব'সে ঝগড়া করছিস?" বলিতে বলিতে মহামায়া চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

পঙ্কজ যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। অবন্তিকা যেভাবে তাহাকে জেরা করিতে সুরু করিয়াছিল, পিসীমা এইভাবে না আসিয়া পড়িলে ইহা কোথায় কিভাবে শেষ হইত বলা কঠিন। হয়তো এই প্রগল্ভা মেয়েটির কাছে পঙ্কজকে শেষ-পর্যন্ত হার স্বীকার করিতেই হইত।

কারণ পঙ্কজের পক্ষে—ঠিক সদুত্তর যাহাকে বলে, তাহা ছিলো না। অবন্তিকাকে কে কবে ভালবাসিয়াছে, কি বাসে নাই, তাহার প্রতি অবন্তিকার লোভ ছিলো, কি ছিলো না,—উভয়ের সংস্পর্শে কে কতটা উচ্ছন্নে গিয়াছিল, এই সব নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির করিবার অপ্রিয়-চেষ্টা পঙ্কজ করিতে যায় কেন ?

পঙ্কজ নিজের কাছেও ইহার ঠিকমত উত্তর পায় না। অবন্তিকা যদি স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাহিত কিংবা মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বলিত, ওগো তুমি ধরা পড়িয়া গিয়াছো ? অবশ্য যদিও তাহার পক্ষে বলা খুবই সম্ভব ছিলো। কিন্তু সত্যই কি সে ধরা পড়িয়া গেলো ?

"কি ভাবছেন ?—চা দেওয়া হয়েছে।" বলিযা অবন্তিকা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এদিকে মহামায়া পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন পড়িবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পঙ্কজের মুখাবয়বে কোনো রেখাই ফুটিয়া ওঠে না। পঙ্কজের প্রতি অবন্তিকার কোনো আকর্ষণ স্পষ্ট করিয়া ধরা না পড়িলেও, একটা আন্দাজ করিয়া লইতে কষ্ট হয় না, কিন্তু পঙ্কজ যেন ধরা পড়িয়াও ধরা দিতে চায় না।

মহামায়া বলিলেন, "পঙ্কজের কি শরীর ভাল নেই ?"

"খুব ভাল আছে পিসীমা, আমার লোহার শরীর,—ভাঙতে জানে না, কিন্তু কেনো বলুন দেখি, আমাকে কি খুব খারাপ দেখাচ্ছে ?"

অবন্তিকা ইহার উত্তর দিল, "শুধু খারাপ নয়—কুৎসিত।"

"রূপ সম্বন্ধে আমার যেটুকু জ্ঞান আছে তাতে এটুকু অন্তত বলতে পারি, মুখশ্রীতে আপনার চাইতে আমি কোনো অংশে খারাপ নই।"

"নিজের চোখে নিজেকে কেউ কোনোদিনই খারাপ দেখে না ঐ তো দুঃখ।"

"পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি মিথ্যা বলবেন না।"

"মিথ্যা বলবেন না, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কুৎসিতও বলতে পারবেন না।"

মহামায়া হাসিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কাটিল।

"আচ্ছা পঙ্কজবাবু, একথা কি সত্যি নয়,—মনটাই আসল, দেহটা তার আউট-লাইন্?"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ মনকে ঘিরেই দেহের কাঠামো তৈরি হয়? যেমন ধরুন, একটা কুৎসিত-মনের দেহ কখনো সুন্দর হোতে পারে না।"

"অর্থাৎ প্রমাণ কোরতে চান. আমার মনটাও কুৎসিত?

অবন্তিকা চুপ করিয়া অনেকক্ষণ পঙ্কজের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, "না. তা চাই না পঙ্কজবাবু! কত-দিন কত রূঢ় কথা বলেছি,—কিন্তু কোনোদিনই—"

অবন্তিকা আর বলিতে পারিল না, অশ্রুজলে তাহার চোখ ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

পঙ্কজ বিস্মিত হইয়া অবন্তিকার মুখের দিকে চাহিল। যে-অবন্তিকা হাসিতে জানে এবং হাসাইতে জানে, যে ঝগড়া করিয়া রাগ করিতে পারে কিন্তু রাগ ভাঙাইতে জানে না, যে সহজ সরল,—নিজেকে প্রকাশ করিয়াও যে রহস্যময়ী, তাহার আজ এ কি পরিবর্তন!

পঙ্কজ আত্মবিস্মৃত হইয়া অবন্তিকার হাত ধরিল। বলিল, "একি, আপনি কাঁদছেন?"

অবন্তিকা নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না, সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলো।

পঙ্কজের মনে হইল সেও ছুটিয়া গিয়া ঐ রাস্তায় নামে। সে এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছে, নিজেও যেন কোথায় ভুল করিয়া বসিয়াছে।

কিন্তু আজ নিঃশব্দে চলিয়া গেলেই কি সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে? আর চোরের মত পালাইয়াই বা যাইবে কেন?

একটু পরেই মহামায়া ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "অবন্তি কাঁদছে কেনো পঙ্কজ?"

"সেই প্রশ্নই তো আমিও করবো মনে করছিলাম পিসীমা!"

মহামায়া হাসিলেন। বলিলেন, "তোমাদের কথা আমি কি বলবো পঙ্কজ? বরং তার কাছ থেকেই তোমাকে বুঝে নিতে হবে।"

"কিন্তু আজ আমাকে আশ্চর্য ঠেকলো পিসীমা! অবন্তিকাকে জানতাম একটি শিক্ষিতা মেয়ে,—তার রূপ আছে, তার গুণ আছে, তার কালচার আছে—"

"কিন্তু সে কাঁদে কেনো, এই না তোমার প্রশ্ন?"

"ঠিক তা নয় পিসীমা, আমি বলতে চাচ্ছিলাম—"

কিন্তু পঙ্কজ কি যে বলিতে চাহিতেছিল, কয়েকবার আমতা আমতা করিয়াও তাহা পরিষ্কার করিতে পারিল না। মহামায়া হাসিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

প্রায় অব্যবহিত পরেই অবন্তিকা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কি বলতে চাচ্ছিলেন, বলুন? আমার মত মেয়ে এত শীঘ্র প্রেমে প'ড়ে যায় কি কোরে,—এই না আপনার কথা? কিন্তু প্রেমেই যে পড়েছি, এ ধারণাই বা আপনার আসে কোত্থেকে?"

"না, না, আমি মিছিমিছি তা ভাবতে যাবো কেন? প্রেম জিনিসটা একটা ব্যাধি,—ওটা কিছুই নয়। ওকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। হুড়মুড় কোরে মুখ থুবড়ে তারাই পড়ে—

"যারা বুদ্ধিমান নয়,—অর্থাৎ যারা এম-এ পাস করেনি।" বলিয়া অবন্তিকা পঙ্কজের প্রবল উচ্ছাসের মুখে হিহি করিয়া হাসিতে লাগিল।

"ছি, আপনি বড় যা-তা বলেন!"

"আচ্ছা, আপনারই বা একথা মনে আসে কেনো যে আমি আপনাকে—"

"আমি হাত যোড় কোরে ক্ষমা চাচ্ছি,—ভুল কি মানুষে করে না ?"

"আপনার নাটকের কি হোলো ?—সেও কি আমিই শেষ করবো নাকি ?"

"খুব ভাল কথা বলেছেন।—পারবেন আপনি শেষ করতে ? তা হোলে একটা অপ্রিয় কাজ থেকে বেঁচে যাই।"

"আমার ব'য়ে গেছে,—এই নিন আপনার নাটক।" বলিয়া অবন্তিকা নাটকের পাণ্ডুলিপিখানা আনিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। "কিন্তু ও-কথা কেনো বললেন পঙ্কজবাবু, নাটক লেখা কি অপ্রিয় কাজ ?"

"তা নয়। আমার নায়ককে তো দেখেছেন—যার কোনো পরিচয় নাই, যে লোকালয়ে থেকেও সমাজের বাইরে,—যার গর্ব করবার কিছু নাই, সমাজ নাই, সংসার নাই,—যে মাথা তুলেও দাঁড়াতে পারে না,—যার পিতৃপরিচয় নাই, মাতৃপরিচয় আছে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে! তাকে আমার নাটকে কোথায় এনে ফেলেছি দেখেছেন তো ? কিন্তু তারপর ? এই তারপরের সমস্যার সমাধান করবো কি কোরে বলুন তো ? মনীষা —যাকে এনেছি আমি নাটকে,—সে তো কোনো দোষ করেনি, তার অত বড় নিষ্ঠা, অত বড় প্রেম—সে কি মিথ্যা হোয়ে যাবে ?"

"কেনো, মিথ্যা হোতে যাবে কেনো ? প্রেমের চেয়ে কি সমাজ বড় ? মনীষার সে-সৎসাহস যদি না থাকে, তবে তার প্রেমই মিথ্যে।"

"নাটক-নভেলে ওটা খুব বড় কথা,—কিন্তু সত্যি কি তা কেউ পারে ? আপনি পারেন,—মনীষার আসনে যদি আপনাকেই বসিয়ে দেওয়া হয় ?"

অবন্তিকা বলিল, "যদিও আমার বড় গলা কোরে বলার কোনো মানে

হয় না, কারণ সত্যিই যখন আমি মনীষা নই,—কিন্তু একথা বিশ্বাস করুন, আমি মনীষা হোলে আপনার নায়ক অরিন্দমকে বুক ফুলিয়ে বিয়ে কোরতাম।

পঙ্কজ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "দেখছি, আপনার হাতে নাটকের দুর্গতি তবে এইভাবেই হবে!"

"একে আপনি দুর্গতি বলেন?"

"হাঁ বলি। এমনি কোরে যারাই সমাজ-বিপ্লব ঘটাতে গিয়েছে. তারাই সকল রকমে বিধ্বস্ত হয়েছে। এ-বিষ বংশানুক্রমে রক্তধারায় সংক্রামিত হয়। এত বড় পাপ আমি করতে পারি না।" বলিতে বলিতে পঙ্কজ শিহরিয়া উঠিল।

অবন্তিকা হাসিয়া বলিল, "আপনার নাটক লেখা উচিত নয়।"

পঙ্কজও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "তবে কি লেখা উচিত বলুন তো?"

"আপনার কিছুই লেখা উচিত নয়। অমন খুঁৎখুঁতে যার স্বভাব সে কি কোনোদিন বই লিখতে পারে!"

"আপনি ঠিকই বলেছেন, বই আর আমি লিখবো না।"

অবন্তিকা ব্যথিত হইল। বলিল, "আপনি রাগ করলেন?"

"না, এ রাগের কথা নয়। নিজেকেই যে পারলে না সুপ্রতিষ্ঠিত করতে,—তার লেখার কোনো দাম নেই।"

"আপনি অমন কথা বলবেন না। আপনার মুখে এরকম কথা শুধু বেমানান নয়, অস্বাভাবিক।"

পঙ্কজ হাসিল।

"হাসলেন যে? আমি কি মিথ্যে বলেছি?"

"দেখুন, বলতে ইচ্ছে করে অনেক কথাই। ইচ্ছে করে, নিজেকে হাল্‌কা কোরে দিয়ে ছুটে এখান থেকে বেরিয়ে যাই। আমাকে ক্ষমা করবেন অবন্তি দেবী,—আমি বড় উত্তেজিত হোয়েছি—হয়তো শেষপর্যন্ত —না, না, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আজ যাই।" বলিয়া পঙ্কজ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলো।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিন অতি প্রত্যূষেই মহামায়াকে সংগে লইয়া অবন্তিকা পঙ্কজের বাসায় আসিল। পঙ্কজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "একি পিসীমা! আপনারা কষ্ট কোরে এলেন কেনো?"

"আচ্ছা, সে-সব কথা পরে হবে। তুমি এসো আমাদের সংগে,—ঠাকুরকে ব'লে দাও, আজ ওখানেই খাবে।"

"কি-এমন ব্যাপার যে আজ সকালেই এমন কোরে ছুটে আসতে হোলো এবং ওখানে না খেলেই নয়।"

"কোনো উপলক্ষ নিয়ে আসিনি পঙ্কজ, তোমাকে নিয়ে যাবো ব'লে এসেছি।—কই, তোমার ঠাকুরকে ডাকো দেখি, আমি ব'লে দিচ্ছি।"

"কাউকেই ডাকতে হবে না,—আপনারা এলেন, আমার ঘরকন্না সব দেখে যাবেন না?—আসুন।" বলিয়া পঙ্কজ সকলকে লইয়া ভিতরে গেলো।

মহামায়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ছোট্ট বাড়ি হোলেও,—বেশ চমৎকার বাড়ি, কিন্তু তোমার বইগুলি এমন অযত্নে গড়াগড়ি যাচ্ছে কেনো পঙ্কজ?"

ও-গুলোকে ঠিকমত গুছিয়ে রাখতে হোলে, নিজেকে গোছানো চলে না, তাই সে চেষ্টা আর করিনি।"

অবন্তিকা হাসিয়া বলিল, "তাই বা কই নিজেকে গোছাতে পেরেছেন?"

এর চেয়ে নিজেকে ভদ্র কোরে তুলবার আমার গরজ নেই। গরজ যার থাকবে—মানে, এমন কেউ এলে, তিনি নিজের গরজেই আমাকে গুছিয়ে নেবেন।"

অবন্তিকার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। মহামায়ার তাহা চোখ এড়াইল না,—তাই তিনি বলিলেন, "সত্যিই তো, ওর কি-এমন গরজ, তা ছাড়া পুরুষমানুষ,—নিজেকে নিয়ে অমন কোরে থাকলেই বা চলবে কেনো।"

পঙ্কজও উৎসাহিত হইয়া বলিল, "কোনোরকমেই চলে না পিসীমা! তাই যদি চলতো, আমাদের বিয়ে করবার কোনো দরকারই হোতো না। ঐ যে দেখছেন মস্ত বড় একটা শেল্‌ফ,—হাতের কাছে পাই না ব'লে ঘরের কোনে আবর্জনার মত প'ড়ে রয়েছে। একটা স্ত্রী থাকলে, এত বড় অনাচার কি হোতে পারতো?"

মহামায়া হাসিলেন। অবন্তিকা হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "পিসীমা, বড় দেরি হোয়ে যাচ্ছে।"

পঙ্কজ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া বলিল, "হলোই বা একটু দেরি। সময় নিযে শকুনির মত টানা-হেঁচড়া করতে থাকলেই কি সময়ের মূল্য বাড়ে? বরং সময়কে না-মেনে চলুন, আনন্দ পাবেন।"

"বেশ, আপনাদের আনন্দে আমি বাধা দিতে চাইনে,—আমি এই বসলাম, তখন কিন্তু আমাকে উঠবার জন্যে তাগিদ দেবেন না।" বলিয়া অবন্তিকা একটি চেয়ারের উপর ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

"কি ছেলেমানুষী করিস্ অবন্তি—নে ওঠ্, কত কাজ প'ড়ে রয়েছে আমার।"

পঙ্কজ অবন্তিকার দিকে চাহিয়া হাসল। বলিল, "নিশ্চয়, মিনিটে-মিনিটে আপনাদের মত ঘড়ি দেখার বাতিক না থেকেও, কত সহজে সময়গুলোকে কাজে লাগাতে জানেন ওঁরা। আপনাদের মত হাস্যকর সময়-বণ্টন নিয়ে পরকে হাসাতে জানেন না।"

কথাগুলি যাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল, সে তখন মুখ গোমরা করিয়া বসিয়া আছে।

"রাগ করলেন ?" পঙ্কজ বলিল।

অবন্তিকা কোন উত্তর দিল না।

গাড়িতেও ইহার প্রতিক্রিয়া চলিল, কিন্তু বাড়ি আসিয়া অবন্তিকা ইহার শোধ লইল। বলিল, "পিসীমার সামনে আমাকে অমন অপমান না কোরলে কি চলছিলো না ?"

"অপমান আবার কি করলাম !

"অপমান নয়তো কি। দোষ যদি করেইছিলাম, আপনি আমাকে ডেকে ব'লে দিলেন না কেনো ? কেনো অমন কোরে সকলের সামনে—"

অবন্তিকা আর কিছু বলিতে না পারিয়া টেবিলের ওপর মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

"আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার কথা যে আপনাকে এতখানি আঘাত করে তা পূর্বে জানতাম না। ভুল বুঝেই হোক, বা যে-কারণেই হোক—আমার ধারণা ছিলো, আপনার ওপর হয়তো আমার কিছু—"

অবন্তিকা মুখ তুলিল না, শুধু ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পঙ্কজ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। সে ইহার সহিত কোনোদিনই অভ্যস্ত নয়,—মেয়েদের চোখে জলও সে দেখিতে পারে না, অথচ মান অভিমান ভাঙাইবার সুনির্দিষ্ট-কৌশলও তাহার জানা নাই। কিন্তু একি আশ্চর্য মেয়েদের স্বভাব! লেখাপড়া শিখিয়াও ইহার কোনো ব্যতিক্রম কাহারো মধ্যে দেখিতে পায় না !—উহারা সবাই এক ! ভালবাসিবার এবং ভালবাসাইবার একই কলা-কৌশল সকলের মধ্যে !—মেয়েদের পক্ষে এটা লজ্জার কথা। ইচ্ছা হইল, অবন্তিকাকে তুলিয়া সে এই কথাই বলে, এ-রীতি তুমি বর্জন করো,—এ তোমার জন্য নয়। তুমি উচ্চশিক্ষিতা,—তোমার রুচি এবং রীতি মার্জিত হওয়া উচিত।

কিন্তু বলিবার অনেক কথা থাকিলেও, পঙ্কজ সেই একই বাঁধা-ধরা নিয়মে অবন্তিকার মুখ তুলিয়া ধরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

অবন্তিকা মুখ তুলিলে পঙ্কজ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আচ্ছা জব্দ করেছেন আমাকে।"

"জব্দ হোতে কে বলছে।"

"কিন্তু মজা এই, কেউ না বললেও জব্দ আমাকে হোতে হচ্ছে।"

আপনার জব্দ হবার কোনো দরকার নেই।" বলিয়া অবন্তিকা দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলো।

মহামায়া চা লইয়া ঘরে আসিতেই পঙ্কজ বলিল, "একটা কথা আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে,—আমার ব্যবহার যদি আপনাদের অপ্রিয় হোয়েই থাকে—"

বাধা দিয়া মহামায়া বলিলেন, "কি বলছো তুমি পঙ্কজ! তোমাকে আমরা ঘরের ছেলে ব'লেই জানি। ছি ছি, অবন্তি কি ছেলেমানুষী করে সব সময়।" বলিতে বলিতে মহামায়া ত্রস্তপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

এই অবসরে পঙ্কজও চলিযা যাইবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় অবন্তিকা আসিয়া বলিল, "কি বলেছি আপনাকে যে অমন কোরে পিসীমাকে লাগাতে গিয়েছেন?"

"লাগাতে আমি কিছুই যাইনি,—শুধু আমার ব্যবহারে কোনো ত্রুটি হচ্ছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম। যাই হোক্, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি।"

"বিদায় নিচ্ছেন কি রকম?—পিসীমা আপনাকে খেতে বলেছেন,—না?"

পঙ্কজ উঠিতে গিয়াও আবার বসিয়া পড়িল। বলিল, 'আচ্ছা।"

ইহার পর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই নিঃশব্দ-পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে উহাদের উভয়ের মনে যে প্রতিক্রিয়া চলিল, তাহারই মর্মান্তিক অভিব্যক্তি দেয়ালের বড় আয়নাটায় প্রতিফলিত হইল। সেইদিকে চাহিয়া অবন্তিকা নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলো।

পঙ্কজ চিৎকার করিয়া মহামায়াকে ডাকিল। মুখে-চোখে জল দিতেই অল্পক্ষণ পরে অবন্তিকা চোখ খুলিল। মাথার কাছে পঙ্কজকে বাতাস করিতে দেখিয়া সে সমস্তই ভুলিয়া গেলো। ভুলিযা গেলো সে কোথায়, কেন আসিয়াছে,—ভুলিয়া গেলো তাহার কালচার কর্তব্য-অকর্তব্যের বিধি-নিষেধ,—তাহার জাগ্রত-চেতনায় রহিল শুধু পঙ্কজ, যাহাকে সে ভুলিতে পারে না, ভুলিতে চায় না। অপলক তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া একসময় সে বলিল, "আমাকে তুমি ফেলে যেও না,—তাহোলে আমি আর বাঁচবো না।

মহামায়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অবন্তিকার আজ বাঁধ ভাঙিয়া গিয়াছে। সে যেন পরম নিশ্চিন্ত হইয়া কথার বোঝা নামাইয়া চলিযাছে: "আমি যে তোমার চেয়ে কত ছোটো আজ বুঝতে পারছি,—কিন্তু কি আশ্চর্য, ছোটো হওয়াই যে আমাদের ধর্ম, এ-শিক্ষা আমাকে এতদিন কেউ দিলে না! মেয়েদের কি বড় হওয়া চলে! একদিন রঞ্জনকে হার মানতে হোয়েছিলো এই পারসোন্যালিটির কাছে। কিন্তু তুমি আমার দম্ভ চূর্ণ করেছো। ভেঙে দিয়েছো আমার অহমিকা, উঁচু মাথা ধূলোর সংগে মিশিয়ে দিয়েছো—যা রঞ্জন পারেনি।"

পঙ্কজ কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া অবন্তিকা বলিল, "কথা ব'লো না—আমাকে আজ বলতে দাও। হয়তো এমন কোরে আর

কোনোদিনই বলতে পারবো না।—হাঁ, রঞ্জন আমাকে ভালোবাসতো, কিন্তু ভালোই সে বেসেছিলো, পারেনি আমার অহংকারকে ভেঙে দিতে, আর তা পারেনি ব'লেই তাকে চ'লে যেতে হোলো।"

"একদিন তোমার পিসীমা বলেছিলেন, রঞ্জন দেখতে অনেকটা আমার মত।"

"পিসীমার ভুল। আমি দেখেছি তোমার গভীর কালো চোখ,—এ-চোখ রঞ্জন কোথায় পাবে। কোথায় রঞ্জনের এই বলিষ্ঠ-সংযম!"

"রঞ্জন কে তা জানি না, কোথায় কতটুকু আমার সংগে সাদৃশ্য তাও আমি জানতে চাই না,—কিন্তু আমি—

কথা আর শেষ হইতে পাইল না, একজন অপরিচিতকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পঙ্কজ নিজেই সাবধান হইয়া গেলো। পঙ্কজের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া অবন্তিকাও চমকাইয়া উঠিল। বলিল, "একি,—আপনি—রঞ্জনবাবু!"

রঞ্জনের নাম শুনিয়া পঙ্কজও অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিল, রঞ্জন!

"কি হয়েছে রঞ্জনবাবু, আপনার এ-বেশ কেন?" অবন্তিকা বলে।

"বাবা মারা গিয়েছেন।"

"বসুন, দেশ থেকে কবে এলেন?"

"কাল এসেছি।"

"কাল এসেছেন,—এতদিন কোথায় ছিলেন?"

"সে অনেক কথা; আর সেই কথা বলবার জন্যেই আজ আমি এসেছি। তোমার কি সময় হবে একটু নিরিবিলি বসবার?"

"খুব হবে, আপনি বসুন,—আমি বরং যাই।" বলিয়া পঙ্কজ উঠিল। অবন্তিকা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, "না, তুমি ব'সো। রঞ্জনবাবুর যদি কিছু বলবার থাকে, তোমার সামনেই বলবেন। আর তা যদি না বলতে পারেন, আমি শুনতে চাইনে।"

পঙ্কজ রঞ্জনের মুখের দিকে চাহিল। রঞ্জন বলিল, কথা এমন কিছু নয়, তবে আমি ইচ্ছা করি না—বিশেষ কোরে ওঁর পরিচয় যখন কিছুই জানি না—

গোলমাল শুনিয়া মহামায়া সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রঞ্জনকে দেখিয়া এবং তাহার অশৌচাবস্থা লক্ষ্য করিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কি হয়েছে রঞ্জন ?"

"বাবা মারা গিয়েছেন।"

"তোমার মা কোথায় ?"

"বালুচরে।"

পঙ্কজ চমকাইয়া উঠিল।

"একটা কথা আমি অবন্তিকাকে বলতে এসেছিলাম," রঞ্জন বলে,— "বাবার মৃত্যুতে যে-পরিবর্তন আমার মধ্যে আজ এলো তা সামান্ত নয়। বাবা বলতেন, ওরে দেখে-শুনে নে। তখন ভুলেও মনে হয়নি, ঐ গদিতে একদিন আমাকে গিয়ে বসতে হবে। অনেক এক্‌সপেরিমেণ্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে অনেক আঘাতই বুক পেতে নিয়েছি। আজ অবন্তিকা আমার পাশে এসে দাঁড়ালে হয়তো—"

"পিসীমা !" অবন্তিকা যেন গর্জন করিয়া উঠিল।

রঞ্জনের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ঐ একটিমাত্র গর্জনেই অবন্তিকার মনের ইচ্ছা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর রঞ্জনের সেখানে থাকাও চলে না, কোনো অনুরোধ করাও সাজে না। বলিল, "আচ্ছা, তাহোলে আমি যাই পিসীমা।"

মহামায়া কি বলিবেন,—ঠিকমত কথা খুঁজিয়াও পাইলেন না, কেবল বলিলেন, "বিহারীলালবাবুর বয়স কত হয়েছিলো ?"

পঙ্কজের চক্ষু বিস্ফারিত হইল, পায়ের নীচের মাটি যেন সহসা কাঁপিয়া

উঠিল, পাগলের মত সে কয়েকবার এদিক-ওদিক চাহিল, তারপর চিৎকার করিয়া বলিল, "বিহারীলাল,—বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ?"

"হাঁ, তুমি তাঁকে চেনো নাকি পঙ্কজ ?" বলিয়া মহামায়া পঙ্কজের দিকে চাহিলেন।

পঙ্কজ একটি কথাও বলিল না, শুধু একবার রঞ্জনের মুখের দিকে চাহিয়া, ছুটিয়া সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলো।

অবন্তিকা চিৎকার করিয়া উঠিল।

"যেও না, যেও না পঙ্কজ!" মহামায়ার উচ্চস্বর সিঁড়ি পর্যন্ত নামিয়া আসিল।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলো, পঙ্কজ ফিরিল না। অবন্তিকা সেই-যে ঘরে খিল দিয়াছে, এখনো পর্যন্ত বাহির হয় নাই। মহামায়া পঙ্কজের মুখের ভাত কোলে করিয়া মৃত্যুর মত স্থির হইয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর আসিয়া অবন্তিকার দরজায় ডাকিল, "দিদিমনি, পিসীমা ভাত নিয়ে ব'সে আছেন।

অবন্তিকা জবাব দিল, "আজকের সমস্ত রান্না রাস্তায় ফেলে দাও গে।"

রাস্তাতেই ফেলিয়া দেওয়া হইল। পঙ্কজ না খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, —সেই অন্ন তাহারা মুখে তুলিবে আজ কি করিয়া ?

কিন্তু দিন কাহারো জন্য পড়িয়া থাকে না,—তাহাদেরও পড়িয়া রহিল না।

মহামায়া বলিলেন, "পঙ্কজ এমন কোরে চ'লে গেলো কেনো ? রঞ্জনের কথায় এমন কিছু সে বুঝেছে—"

"না পিসীমা, রঞ্জনবাবু তাকে কিছুই বলেননি।"

মহামায়া চুপ করিয়া গেলেন। কোনোকিছু স্পষ্ট করিয়া জানিতেও ভয় করে, অথচ না জানিয়াও স্থির থাকা যায় কই? কিন্তু রঞ্জনই বা এতকাল পরে আসে কেনো? তাহার সহিত সকল সম্বন্ধই তো অনেককাল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে কি জানিয়া শুনিয়াই পঙ্কজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল? কিন্তু রঞ্জনের সহিত পঙ্কজের যে কোনো পরিচয় আছে, তাহাদের ব্যবহারে তো কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। পঙ্কজ বরং বিহারীলালের নাম শুনিয়া চমকাইয়া উঠিয়াছে, তাহার অস্বাভাবিক পরিবর্তন তিনি তো নিজের চোখেই দেখিয়াছেন।—তবে?

কিন্তু সকল সমস্যারই মীমাংসা হইয়া গেলো: তিনদিন পরে অবন্তিকার নামে পঙ্কজের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল।

অবন্তিকা,

যে-নাটক এতদিন শেষ করতে পারিনি, আজ তার নির্মম-পরিণতি দেখতে পেলাম। নাট্যকারের নির্মম-হস্ত অতদূর পৌঁছুতে পারতো না—জানি, পৌঁছুলেও তুমি তাকে ক্ষমা করতে না। আজ নিয়তি তার নিষ্ঠুর-হাতে অরিন্দমের অদৃশ্যলিপি লিখে গেলো। দুঃখ কোরো না, এই তার সহজ-পরিণতি। যা সহজ, যা একান্ত স্বাভাবিক তাকে যুক্তি দিয়ে বাঁধতে যেও না। আমার বিধাতা-পুরুষ আমাকে পাঠিয়েছিলেন সম্পূর্ণ রিক্ত কোরে। যে-মাটিতে মানুষ চলাফেরা করে তাও আমার নেই। যে-নাটক লিখে যাবো ব'লে সংকল্প করেছিলাম, তা শেষ কোরে না যেতে পারলেও, তার যবনিকা টেনে দিয়ে গেলাম। মনীষার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ তুমিই করবে, আমি তাকে আর টেনে নিয়ে যেতে চাই না। জীবন-নাট্যের

পটভূমিকায় আমার আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান—নাটকে অমূল্য হোলেও, ব্যক্তিহিসেবে তার কোনো মূল্যই নাই। তাকে তুমি ভুলে যেও। ফাঁকি দিয়ে কিছু পেতে চাই না, কারণ অতিবড় ফাঁকি বিধাতাই আমাকে দিয়েছেন। মনে গর্ব ছিলো, আমার সকল ফাঁকই ভরিয়ে তুলবো কর্মশক্তির জোরে। কিন্তু এ যে কত বড় মিথ্যা তা আজ বুঝেছি। মানুষের তৈরি সমাজে মানুষই আজ বন্দী। অরিন্দমকে তো দেখেছো, তার সমাজ নাই, তার সংসার নাই,—যে-ব্যাক্বোন মানুষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাও তার নাই।—একটি লোক চোরের মত এই পৃথিবীতে এলো, চোরের মত মুখ লুকিয়েই তাকে চ'লে যেতে হোলো। এ তার বিধাতার অলংঘনীয় নির্দেশ।

অরিন্দমের মধ্য দিয়েই আমি আমার জীবন-কাহিনী লিখে গিয়েছি,—নইলে ও-নাটক লিখবার আমার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। রঞ্জনকে এর আগে দেখিনি। আমার মুখে রঞ্জনের আদল দেখে তোমার পিসীমা চম্‌কে উঠেছিলেন,—আজ তার সকল অর্থ পরিষ্কার হোলেও, আমি এ-পরিচয়ে লজ্জাই পেলাম। যে-পিতার কাছে আমি কেউ নই,—যার অশৌচ-পালন করবার অধিকারও আমার নেই, সেই হতভাগ্যকে তোমরা—সমাজের সুসন্তান যারা, উপেক্ষা কোরো, বর্জন কোরো।

যে-সময়টুকুর জন্যে তোমাকে পেলাম, আমার জীবনে তার দামই অনেক। সেই আমার সারাজীবনের সঞ্চয় হোয়ে রইলো। এর চেয়ে বেশী লোভ আমি করবো না,—আমার সইবে না। তবে দুঃখ দিয়ে গেলাম, তার চেয়ে বেশী দুঃখ পেলাম আমি নিজে,—এ তুমি বিশ্বাস কোরো। যে-পাপ আমার বংশের ধারায়,—তার ধারাবাহিক স্রোত-পথকে আমি নিজের হাতে বন্ধ কোরে দিয়ে যেতে পারলাম, এই আমার বড় গর্ব।

আমাকে খুঁজবার চেষ্টা কোরো না। কারণ এ-চিঠি যখন তুমি পাবে, তখন আমি ভারতের সীমা অতিক্রম করেছি। চোখের জল ফেলে নিজের কল্যাণকে ভুলো না। আমি সকলের অকল্যাণ মাথায় নিয়ে তোমাদের দৃষ্টিপথের বাইরে চ'লে যাচ্ছি। অনেক ভুল করেছি, তার জন্যও আজ ক্ষমা চাই। পিসীমাকে ব'লো তিনিও যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

পঙ্কজ

মহামায়া আসিয়া দেখিলেন, অবন্তিকা একখানা চিঠি হাতে করিয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া আছে। বলিলেন, কি হয়েছে অবন্তি ?

অবন্তিকা পঙ্কজের চিঠিখানা দুইহাত দিয়া ঠেলিয়া দিল।